KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 8/1 8/2 8/3 8/4-5 8/6	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ শ্রাবণ ১৩২৮ আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩২৮ চৈত্র ১৩২৮
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রমথ চৌধুরী, সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

—:০:—

রোগশয্যায় শুয়ে "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা" তিনদিন ধরে পড়ে কাল শেষ করলুম। ঐটুকু বই শেষ করতে অতদিন লাগ্‌ল, তার থেকেই বোঝা যায় যে সাধারণতঃ আমাদের পড়বার সময় কত কম। আর ঐ সময়ের মধ্যে যে শেষ করতে পেরেছি, সেও বল্‌তে গেলে রোগের কৃপায়। সুতরাং আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল যে মন্দের মধ্যেও ভাল আছে।

কেউ কেউ হয়ত বল্‌বেন যে নভেল হলে একদিনেই শেষ হত, এবং একটানা পড়বার জন্যে রোগের অবতারণা আবশ্যক হত না! কিন্তু নভেলের প্রতি,—তা' সে যেমনই নভেল হোক্‌,—বিশেষতঃ আমার এবং সামান্যতঃ শতকরা-একজন-শিক্ষিত বাঙ্গালী মেয়ের যে মনোগত পক্ষপাত আছে, সে দুর্ব্বলতা-দোষ স্বীকার করেও আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ব যে, এ বই একবার ধরলে শেষ করবার ইচ্ছা নভেলের তুলনায় কিছু কম হয় না। অনেকদিন কোন বাঙ্গলা বই পড়ে এত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইনি, এমন মন খুলে অন্যের কাছে প্রশংসা করিনি। যদিও উপন্যাসক্ষেত্রে নির্ব্বিচারে মুড়িমিছরির প্রতি সমান লোভ দেখাই বলে আমাদের সর্ব্বভুক্ বদ্‌নাম হয়ে গেছে, কিন্তু নিজের জাতবোনের সপক্ষে এবং সত্যের খাতিরে এটুকু বল্‌তেই হবে যে, আমাদের সাহিত্য-রসাস্বাদনের ক্ষমতা এখনো একেবারে লোপ পায়নি। খারাপকেও ছাড়তে পারিনে বলেই প্রমাণ হয় না যে কোনটা খারাপ কোনটা ভাল, সে সম্বন্ধে আমরা জাত-অন্ধ!

স্বজাতির হয়ে এই অনাহূত কৈফিয়ৎ দানান্তে প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক্। সেটি সংক্ষেপে হচ্ছে এই যে, বইখানি আমার খুব ভাল লেগেছে এবং সেই ভাললাগাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছে হয়েছে, কেন জানিনে;—সম্ভবতঃ দানের বদলে প্রতিদান, এবং দশজনকে ভাল জিনিষের ভাগ দেবার সহজ প্রবৃত্তির প্রেরণায়।

বল্‌ছিলুম যে নভেল পড়ার চেয়ে এ বই পড়বার আগ্রহ কোন অংশে ন্যূন নয়; বরং এক হিসেবে ধরতে গেলে ঢের বেশি। কারণ নভেল যতই হাসায় কাঁদায়, যতই মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক সত্যের ছলনা করে, তবু মনের এক কোণে এ জ্ঞানটুকু লুকানো থাকে যে এ কথা সত্য নয়, এ লোক কাল্পনিক, এ ঘটনার উৎপত্তি মস্তিষ্কের কারখানায়। কিন্তু সত্য যখন কল্পনার বহুরূপ ধরে ও নানা রঙ ফলায়, তখনি মন যথার্থ বিচলিত হয়;—তবে এ মণিকাঞ্চন যোগ আমাদের দেশে দুর্লভ। কেননা আমাদের বেশিরভাগ লোকের জীবন বৈচিত্র্যহীন ও একই বাঁধা পথের পথিক। যদি জাতিকুল এবং আর্থিক অবস্থা জানা যায় তবে কোন একজন বাঙ্গালীকে না চিনেও বোধহয় তার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখ্‌তে বিশেষ কষ্ট হয় না। Mark Twain-এর এক দৈনিকলিপি শুনেছি "Got up, had breakfast, went to bed"—এই তিনটি মহৎ ঘটনার বিবৃতিতেই পর্য্যবসিত হয়েছিল! সেইরূপ আমাদের দেশে অধিকাংশ জীবনই জন্ম মৃত্যু বিবাহরূপ তিন মহা ঘটনার সমষ্টিমাত্র। বাঙ্গালীর জীবনে অর্থকষ্ট ভিন্ন অপর কষ্ট, অন্নচিন্তা ভিন্ন অপর চিন্তা, সাংসারিক সুখ ভিন্ন অপর সুখ, এবং পারিবারিক ঘটনা ভিন্ন অপর ঘটনা যে এমন হিল্লোল তুল্‌তে পারে, সে কথা অপ্রত্যাশিত বলেই এমন

কৌতূহলোদ্দীপক ও আনন্দদায়ক। মাণিকতলার বাগানের খবর হয়ত আমরা কানাঘুষায় শুনতে পেতেও পারতুম, কিন্তু জেলের দরজা খোলা বা আন্দামানের রহস্য উদ্‌ঘাটন কি কোনকালে আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল?—সাধারণ পাঠকপাঠিকার পক্ষে জন্মান্তরগ্রহ ভিন্ন দ্বীপান্তরের গুপ্তকথা আপনাহতে জানবার কোন উপায় নেই। ছবিগুলি সব সময় উল্লাসকর না হলেও, অচেনা এবং অজানার মোহে মনকে যে টেনে নিয়ে যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নরকের দ্বারেও উঁকি মেরে দেখ্‌তে ক্ষতি কি, যদি ভিতরে ধরে' নিয়ে যাবার ভয় না থাকে?—বিশেষতঃ এ নরক অনন্ত নয়, তাই ভীষণ হলেও অসহ্য বোধ হয় না। কবি বলেছেন দুঃখের সময় সুখস্মৃতির মত এমন পরমদুঃখময় আর কিছু নেই; সেই হিসেবে এও বলা যেতে পারে যে দুঃখ-অন্তে দুখ-স্মৃতির উদ্বোধনের মধ্যে একপ্রকার সুখ আছে। তা ছাড়া বইটি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনী হলে হয়ত অপাঠ্য হত। কিন্তু এর মধ্যে এতরকমের এত ছবি, এত গল্প, এত তথ্য, এত বর্ণনা নদীর মত বহমান, যে তার স্রোতে দুঃখের জঞ্জাল কোথায় ভেসে যায়।

জেলে ত অনেকেই যায়, কিন্তু প্রথমতঃ যাবার কারণের পিছনে সব সময়ে সমস্ত বাঙ্গালীর জাতীয় হৃদয় থাকে না; এবং দ্বিতীয়তঃ যে যায় তার ভিতরে সব সময়ে বিশিষ্ট বাঙ্গালী মন থাকে না। এই দুই উপাদানের সমাবেশে বইখানি এমন মনোহর হয়েছে। ১৯০৫ শালের স্বদেশীয়ানার ঢেউয়ের তোড় কমে এলেও এখনো সম্পূর্ণ মরে' যায়নি—কালের অলিগলিতে এখনো তার প্রতিধ্বনি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা কেউ সে সম্বন্ধে অল্প কিছু জানি, কেউ

বেশি জানি; কিন্তু সকলেই ভিতরকার সব কথা জানবার জন্য উৎসুক। তাই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবার পক্ষে বইটির বিষয়ই যথেষ্ট; তার উপরে লেখকের রচনানৈপুণ্য সোনায় সোহাগা। একটি সামান্য ঘটনায় লিপ্ত থাকবার অব্যবহিত পরে তার বিশদ ও সরস বর্ণনা লেখা কিরূপ শক্ত তা যখন ভেবে দেখা যায়, তখন এতগুলি বিভিন্ন বিচিত্র ঘটনা স্মৃতিপটে উজ্জ্বল রেখে এতকাল পরে সেগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে, সুললিত ভাষায় ও সংযতভাবে লোকের কাছে যথাযথ প্রকাশ করা যে কত কঠিন কাজ—এবং সেটি অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করা যে কতটা মানসিক শক্তির পরিচায়ক, তা' সহজেই অনুমান করতে পারা যায়। আর ইতিমধ্যের সেই সময়টি কিছু সুখশয্যায় শুয়ে, বা আরামচৌকীতে বসে', বা লেখাপড়ার চর্চ্চায় বুদ্ধিতে শাণ দিয়ে কাটেনি;—কেটেছে লোটাকম্বল হাতে তীর্থে তীর্থে ঘুরে, বা জেলের নির্জ্জন কুঠরীর অকথ্য কষ্টের মধ্যে বসে, বা আন্দামানের অপমানের কশাঘাতের জ্বালা সয়ে,—কেটেছে রোষে, ক্ষোভে, নিরাশায়, উৎকণ্ঠায়,—কেটেছে অর্দ্ধাশনে, অনশনে, প্রাণান্ত পরিশ্রমে, অসাধারণ যন্ত্রণায়। ১২।১৪ বৎসর এইরূপ জীবন যাপনের পর পাগল না হয়ে উল্টে যার হাত থেকে এইরকম বই বেরোয়, তার হাতের পিছনে যে মন আছে সে মন আমাদের নমস্য;—আমরা বল্‌তে এই ক্ষুদ্র সাংসারিক জীব, যারা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাই, মশা মারতে কামান পাতি; এবং আমরা বল্‌তে আধুনিক বাঙ্গালী, যারা স্বরাজলাভের জন্য উদগ্রীব, কিন্তু প্রায়ই ভুলে যাই যে মনের স্বরাজ লাভ করাই বাইরে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রধান ও প্রথম সোপান। এই বই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ও বিশ্বাস

করবার সাহায্য করে যে, এই প্রত্যক্ষ জড়পিণ্ড গণ্ডগোলপূর্ণ বস্তুজগতের অন্তরালে মন নামক একটি চিৎপদার্থ আছে, যা আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, আশা ছাড়ে না ও লক্ষ্য ভোলে না। "তিমির রাত্রি, অন্ধ যাত্রী, সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে!" এ দীপ মানুষের মন ভিন্ন আর কি হতে পারে? যে দীপ সেই মহাপ্রদীপের একটি স্ফুলিঙ্গ, তাই এমন অনির্ব্বাণ-জ্যোতিষ্মান।

এই দীপের হাস্যোজ্জ্বল শিখাটি আমাদের বিশেষরূপে উপভোগ্য মনে হয়েছে। এ হাসি কোথা থেকে আসে? "ঘোর বিপদ মাঝে তুমি কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস?"—কে জানে। শুধু এইটুকু জানি যে সাহিত্যেই বল, জীবনেই বল, এই প্রাণ খুলে হাসবার ও হাসাবার ক্ষমতাটি অমূল্য নিধিবিশেষ। ইহলৌকিক ভাবে দেখতে গেলে, এই কড়িই আমাদের সুস্থিরভাবে ভবনদী পার হবার একমাত্র সম্বল। বাঙ্গালী জাত স্বভাবতঃ পরিহাসরসিক ও আমোদপ্রিয় বটে, কিন্তু সে রসিকতা প্রায়ই ইতরতার কাছ ঘেঁসে যায়, এবং সে আমোদে সবলতা সরলতার ভাগ কমই থাকে। আত্মীয়স্বজন বাড়ীঘর ছেড়ে এসে, দেশব্রত অঙ্কুরে বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখে, জেলের ঐ লোমহর্ষণ গণ্ডির মধ্যে বাস করে, মকোদ্দমার অনিশ্চিত ফলের বিভীষিকা মাথার উপর ঝুলে থাকা সত্ত্বেও এ কয়টি বঙ্গসন্তান যে কি করে' মনে ঐ অদম্য স্ফূর্ত্তি রাখ্‌ত, কি করে এক পাল ছুটি-পাওয়া ইস্কুলের ছেলের মত দিনরাত কাটাত, তা ভাবলে আমাদের মত সাবধানী, সঙ্কুচিত, সশঙ্ক ব্যক্তির মনে সম্ভ্রমমিশ্রিত বিস্ময়ের উদয় হয়। চতুর্থ পঞ্চমযুক্ত মোটা জেলার-বাবুর ব্যঙ্গচিত্র ও "চ্যাংরার" দলের মস্করাতে জেলের

অধ্যায় এমন ঝল্‌মল্ করছে যে, অনেক গৃহপালিত শাবকের বোধহয় সে-সময়কার কয়েদী হতে সাধ যায়,—অবশ্য "লপ্‌সি" প্রভৃতি দু'একটা দুঃস্বপ্ন বাদ দিয়ে! আন্দামান-অধ্যায় অপেক্ষাকৃত নীরস, তবুও অত্যাচারের মাত্রা কমবার পর তরকারী রাঁধবার চেষ্টাচিত্র প্রভৃতি অতি উপাদেয়। সকল অবস্থায় স্ফূর্ত্তির মত, সকল সময়ে লেখকের সংযমও একটি "অ-বাঙ্গালী" গুণ বলে' মনে হয়। কোথায়ও হাহুতাশ, মর্ম্মোচ্ছ্বাস, অবান্তর বাক্যবিলাস বা অহমিকার লেশ নেই; সব বর্ণনাগুলি একটি প্রশান্ত স্মিতহাস্যে মণ্ডিত, গল্প কোথায়ও দাঁড়িয়ে হাঁফ ছাড়ে না বা ভারি বোধ হয় না,—হাল্কা পায়ে সমতালে গন্তব্য পথে ছুটে চলে। সে পথ কোথায়ও হাস্যকিরণে উজ্জ্বল, কোথায়ও করুণরসে সজল, কিন্তু কখনই ভাবাতিশয্যে ফেনিল বা কটুকাটব্যে পঙ্কিল নয়। এ বইয়ের একটি মহৎ গুণ এই যে তা নিঃসঙ্কোচে আবাল-বৃদ্ধবনিতার হাতে দেওয়া যায়, ও নির্ভয়ে পারিবারিক মজ্‌লিসে চেঁচিয়ে পড়া যায়। অনেক শ্রুতকীর্ত্তি লোকের নিকটতর পরিচয় পাওয়াও লাভের মধ্যে গণ্য; বিশেষতঃ কানাইলালের কঠোর পৌরুষ ও কঠোরতর দণ্ড মন থেকে শীঘ্র মুছে যাবার নয়। এই প্রকৃতির ছেলে যখন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করবে,—এমনি নির্ভিক, নির্লিপ্ত, বিনয়ী ও সদাপ্রফুল্ল,—এমনি উচ্চমনা, সুস্থশরীর, একনিষ্ঠ ও শ্রমশীল,—তখনই বুঝ্‌ব যে আমাদের স্বরাজের স্বর্গরাজ্য সন্নিকট, এখনকার মত সুদূরপরাহত নয়। "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা" নব মেঘদূতের ন্যায় আমাদের অধীনতাকাতর চিত্তে স্বাধীনতা-অলকার সুসম্বাদ বহন করে' এনেছে।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

কবি মধুসূদন

———:*:———

(১)

মোরা শুধু শিখেছিনু ভালবাসাবাসি
কুসুমিত উপবনে; বামা-কণ্ঠ ধরি',
তারি অঞ্চলের মাঝে সুখের প্রত্যাশী,
আলস্যে সোহাগে দিতে জীবনেরে ভরি'।
আরো মোরা শিখেছিনু হৃদয়ে সতত
জাগায়ে তুলিতে শুধু করুণ কোমল
সঙ্গীতের সুরধারা; আপনা-বিহ্বল
ফুটিয়া রহিতে শুধু কুসুমের মত।
তুমি আসি' জ্বালাইলে হোমাগ্নির শিখা,
হে স্বর্গীয় বীর কবি! হে মধুসূদন!
এ-বঙ্গ-আকাশ-ভালে পরাইলে টীকা
বীরত্বের,—নিনাদিয়া গম্ভীর বচন
বজ্রকণ্ঠে, আলস্য জড়তা করি দূর,
দেখাইলে অন্তরের নব অন্তঃপুর।

(২)

যেথা শুধু ব'য়ে যেত মলয় সমীর,
তুমি সেথা ছুটাইলে ভীম প্রভঞ্জন

কাদম্বিনী-নাদে, যত সোহাগ-স্বপন
নিমেষে ধাঁধিয়া দিল শিখা দামিনীর।
হোক্ আজি নির্ব্বাসিত কুঞ্জ-গেহ হতে
বাঙ্গালার কণ্ঠে যত আধ-আধ ভাষা
প্রণয়ের সোহাগের,—রক্ত-লিখা-স্রোতে
তব বীরগাথা হৃদে নাচাক্ দুরাশা!
"গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী",
তেমনি এ বাঙ্গালার ক্লিষ্ট খিন্ন হিয়া,
বাজায়ে মরণ-বাদ্য, চমকি দামিনী,
ছুটুক দুরাশা পানে ভীম নিনাদিয়া ঃ—
তুমি দেব ঊর্দ্ধ হ'তে নেহারী পুলকে,
গাহ পুনঃ নব গীতি আনন্দ-আলোকে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিদ্রোহী

এসেছি আবার—
স্মৃতির কঙ্কালপরা রুদ্র কাপালিক,
হস্তে লয়ে রক্ত-সুরা-পাত্র বেদনার।
যাও সামাজিক
কপোত, আনন্দশস্য-সমাকীর্ণ নীড়ে,
কূজিতে প্রেমের সৌধে ভক্তি সনাতন;
যাবে না সে ভিড়ে,
বজ্রচঞ্চু এই শ্যেন—সর্পের মতন
বিশ্বাস-বিবরে ঢুকি, নিদ্রা-সুখলীন
মূষিকের গায়
ঢালিবেনা নিজ তীব্র গরল মলিন,
ভাগ্যের শোণিত হতে মথিত হিংসায়।
কারে হিংসা করি ?—
জানিনা; চিন্তার ফণা করিয়া বিস্তার
নিস্ফল আক্রোশে শুধু খুঁজে খুঁজে মরি।
নাহিক নিস্তার,
বিশ্ব-রচনার মূল শূন্য যদি হয়;
আমারি বিষেতে শূন্য হয়ে যাবে নীল।

নাহি মোর ভয়,
লোকালয়-জাত কুণ্ঠা, সান্ত্বনা ফেনিল,
শাস্ত্রের পরিখা-বদ্ধ ধারণা দুর্জ্জয় !
আমার নিশান,
চক্ষেতে দুর্ব্বার জ্বালা বিদ্যুদগ্নিময়,
বিকট ভৈরব রবে বাদিত বিষাণ
উন্মাদ অধরে,
তাম্র পলাশের মালা কণ্ঠে, লেলিহান্
সংশয়ের জিহ্বা সম,—মুষ্টিত এ করে
দুর্জ্জেয় বিধান।
নিয়মে, কৌশলে, প্রেমে যা-কিছু বিশ্বাস,
ফুৎকারে উড়িয়া যাক্—পাপিয়ার তান,
মলয় নিঃশ্বাস
মৃদুল বিষাদপূর্ণ, করিবনা দান।
আসি নাই দিতে কলহাস্যের নির্ঝর
প্লাবন-মুখর,
কিম্বা দিতে শরতের শুভ্ররুচিসার
শেফালি সম্ভার—
এসেছি অবজ্ঞা দিতে, আর পরিহাস,
—মিথ্যা হোক্ নাশ !

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক।

ওঁ

দরিদ্র-নারায়ণায় নমঃ

—:*:—

শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত 'সবুজ-পত্র' মহাশয়

সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

বাংলার সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিকগণকে বর্ত্তমান স্বরাজ আন্দোলন আলোচনা করবার জন্য আপনি 'সবুজ-পত্রে' আহ্বান করেছেন দেখে আনন্দিত হয়েছি। দলাদলির জন্য বিখ্যাত আমরাও মাতৃপূজার সময় হয় ত একটি শতদলে এবার পূজা করতে পারব।

আপনার নিমন্ত্রণ পত্রে একটা ত্রুটী আমার চোখে পড়েছে। বাংলার হাজার অধিবাসীদের মধ্যে নয় শত নিরনব্বই জন দরিদ্র; একমাত্র এই সম্প্রদায়েই জাতিভেদ নেই; কেননা এর মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান, ক্রিশ্চান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং নিরক্ষর কৃষকও আছেন। আপনি কি তাঁদের বাদ দিয়েছেন।

তা নয়; প্রাণের ব্যাকুলতায়, বেঁচে থাক্‌বার চিরন্তন চেষ্টায় দরিদ্র যখন সবুজ-পত্রে আত্ম প্রকাশ করবেন, তখন তিনি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক কিম্বা অন্য যা হয় একটা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বেন।

দরিদ্রগণ অসাম্প্রদায়িক বলেই জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করে দেখ্‌তে পারেন না—এটা politics, ওটা metaphysics, আর একটা sociolgyএ জ্ঞান তাঁদের নেই; কেন না তাঁরা রাত্রিদিনই Reality-ইর মধ্যেই বাস করেন। তাদের তরফ হতে স্বরাজ সম্বন্ধে যদি কিছু আলোচনা করি, আশা করি আপনি সাদরে গ্রহণ করলেও করতে পারেন।

বাংলার প্রায় সকল মাসিক পত্র কেন নীরব জানি না; দরিদ্রগণ এই জন্য নীরব যে আজ পর্য্যন্ত কেউ তাঁদের মায়ের প্রতিমা দেখবার জন্যে আহ্বান করেন নি; পাঁচ, দশ, পনর, কুড়ি টাকা তাঁরা কোথায় পাবেন? এক মাসের মজুরী; মনুষ্যত্বের বিনিময়ে।

পূর্ব্বে এই আশ্বিনমাসে মহামায়ার পূজায় তাঁদেরও আসন সুনির্দ্দিষ্ট এবং সম্মানের ছিল এখন পৌষমাসের মাতৃপূজায় একমাত্র তাঁদেরই স্থান নেই যাঁরা সংখ্যায় হাজারের মধ্যে নয় শত নিরনব্বই জন এবং শক্তিতে এত বড় ব্যুরোক্রেসী-যন্ত্রটাও কাঁধে করে রাখ্‌তে পারে। এ কেমন মাতৃপূজা? এ কেমন ডিমোক্রেসী? ডিমোক্রেসী তাঁদের কাছে প্রচার করতে যাওয়া বাতুলতা, যাঁদের সকলেরই দেহ একই রকমের অস্থিচর্ম্মসার!

স্বরাজ শব্দটির অর্থ নিয়ে আজ পনর বৎসর যথেষ্ট বাদানুবাদ চলেছে। শব্দটি একে সংস্কৃত, তাতে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল একজন পার্শির মুখ দিয়ে, যিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জ্ঞান লাভের পথ কখনো অবলম্বন করেন নি; শব্দটি প্রথম আঘাত করল বাঙালীর হৃদয়ে যাঁরা হৃদয়ের আবেগের জন্য প্রসিদ্ধ। শত শত বাঙালী কংগ্রেস

হতে বার হয়ে সমস্ত বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে যেখানে সেখানে যেমন তেমন করে স্বরাজের ব্যাখ্যা করতে থাকেন; শেষে দাঁড়িয়েছিল স্বরাজ আর কিছুই নয় আমার রাজত্ব। কংগ্রেসে দলাদলি পেকে উঠ্‌লেও পাছে দুখান হয়ে যায় এই আশঙ্কায় বাংলা সংবত হয়ে গেলেন, কিন্তু বোম্বায়ের গৃহবিচ্ছেদে সুরাটে দক্ষ যজ্ঞ হয়ে গেলে; তখন বাংলার পোলিটিসানগণ কবির শরণাপন্ন হলেন; কবি একটা বস্তু দেখিয়ে দিলেন; একটা রফা চরমপন্থী এবং নরমপন্থীদের মধ্যে হয়ে গেলে; কিন্তু বাক্য নিয়ে যাঁরা জীবন কাটাতে পারেন তাঁরা প্রয়াগে সমবেত হয়ে স্বরাজের একটা বেড়া-দেওয়া মানে করলেন; আবণর দলাদলি আরম্ভ হল; চরমপন্থীগণ কংগ্রেস হতে ছিট্‌কে পড়লেন, এইভাবে কিছুদিন কাট্‌ল। আনি বেশান্ত হোমরুলের ধ্বজা তুলে দেওয়া মাত্রই ভারতবর্ষের নবীন-যুবক-মন জেগে উঠ্‌ল; প্রবীণেরা আপত্তি তুল্‌লেন; নবীনের হৃদয়ের আবেগের সম্মুখে তাঁদের আপত্তি ভেসে গেল; 'হোমরুল' কংগ্রেস থেকে প্রচারিত হল; কিন্তু ইংরাজি শব্দটায় ভারতের মন তেমন খুসি হল না; রাউলেট এ্যাক্‌ট, পাঞ্জাবের ব্যাপারে লোকের মন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল অমনি কংগ্রেস থেকে মহাত্মা গান্ধী আবার প্রচার করলেন স্বরাজ। পনর বৎসর পরে স্বরাজ নবীন যুবকের দিব্যকান্তিতে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু দরিদ্রগণ জিজ্ঞাসা করেন বস্তুটি কি! টাটা কোম্পানীর কারখানায়, দিশী লোহায় দিশী মিস্ত্রীদের হাতে গড়া, দরিদ্রদের চিরদাস করে রাখ্‌বার একটা যন্ত্র নয় ত! বারমিংহামে তৈরী যন্ত্রের ভার বইতে তাঁদের শ্রী, স্বাস্থ্য, সহজ জ্ঞান, আনন্দ, আত্মসংযম

ত গেছে; তার স্থানে এসেছে ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, অবিশ্বাস, ইত্যাদি।

স্বরাজ মানে কি যে-যন্ত্রটি ইংরাজ, ভারতবাসী stokerএর সাহায্যে পরিচালনা কচ্চেন সেই যন্ত্রটি, সুধু পরিচালকগণ সকলেই ভারতবাসী হবেন?

তাই যদি হয় তা হলে দরিদ্রদের তাতে কি লাভ! বরং ভয় করবার যথেষ্ট কারণ আছে; কেন না যন্ত্রটি একে বিদেশী; ক্রমশই তার নূতন নূতন ধারাল দাঁত (নূতন নূতন রাজ কর) দরিদ্রদেরই বুকে বিঁধ্‌তে থাক্‌বে। সেটাকে খাড়া রাখ্‌বার মূল্য তাঁদেরই দিতে হবে; এই মূল্যের নাম মনুষ্যত্বের দাবী ত্যাগ করে চিরদাসের মধ্যে গণ্য হওয়া।

এই জন্যই, যন্ত্রের নাম শুন্‌লেই দরিদ্রগণ শিউরে ওঠেন। দরিদ্রগণ চাইছেন যন্ত্র নয় যন্ত্রীকে; ছায়া নয়, সত্যকে। বাংলা নীরব কিন্তু এ নীরবতার কারণ ঔদাসীন্য নয়, আপনারও সেই বিশ্বাস দেখে আমার বিশ্বাস দশগুণ বেড়ে গেছে; এ নীরবতার কারণ বস্তু নির্ণয়ের জন্য মনকে বাইরে ছুটে বেড়াতে না দিয়ে ধরে রাখা; আরও যে অন্য অন্য কারণ নেই তা নয় কিন্তু সেগুলি বল্‌তে গেলে দলাদলির সৃষ্টি হতে পারে এবং তাতে বস্তু নির্ণয়ের ব্যাঘাত ঘট্‌বে এই জন্যও বটে বাংলা নীরব, কিন্তু নিশ্চেষ্ট নয়। যে সকল রুদ্র-ভাব বিচ্ছেদ ঘটায় সে সকল সংযত এমন কি নির্মূল করবার দক্ষতা বাঙালী দেখাচ্ছেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন পূর্ব্বে ত্যাগের পরিমাণে কথাই বেশি বল্‌তেন এখন যতই ত্যাগ করছেন, ততই নীরব হয়ে পড়চেন। বাংলাই ভারতবর্ষকে চিন্তা করতে শিখিয়েছেন, এখন বিদেশীকে আত্মসাৎ

করবার কৌশল বাংলাই ভারতবর্ষকে শেখাবেন। বাংলা নিশ্চেষ্ট নহেন। ভারত-সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়েছিল প্রথম এই বাংলাতেই, স্বরাজও প্রতিষ্ঠিত হবে প্রথম বাংলাতে।

বারমিংহামের কলে তৈরী যন্ত্রে মরার চেয়ে, টাটা কোম্পানীর কারখানায় তৈরী কলে মৃত্যু ঘট্‌লে ভাল স্বর্গ হবে এ আশ্বাস দরিদ্রগণকে এ যুগে দেওয়া বৃথা। মধ্যযুগের এ সব ঘুম পাড়ানীর গান আর কি এখন কেউ শুন্‌বেন?

আমার মনে হয় বাংলার মনীষিগণের হাতে এই একটা কাজ রয়েছে; দরিদ্রগণকে বাক্যে নয়, ব্যবহারের দ্বারা, তাঁদের মনুষ্যত্বকে যন্ত্রের অধীনতা হতে স্বাধীন করে দেবার ব্যবস্থায়, দরিদ্রগণকে প্রত্যহ বুঝিয়ে দেওয়া যে স্বরাজ কোন যন্ত্র নয়; কিন্তু একটি উপলব্ধি।

কিন্তু এ কাজ তিনিই করতে পারবেন যিনি অন্তরের সঙ্গে বলতে পারবেন "হে আমার দারিদ্র-দেবতা, আমি এসেছি আজ তোমার সেবা করতে জ্ঞানে জ্ঞানী, প্রেমে প্রেমিক, কর্ম্মে দক্ষ হয়ে"। মূর্খের, স্বার্থপরের, নিষ্কর্ম্মার স্থান স্বরাজে নেই।

দরিদ্রগণ আজ কোথায় এসে পড়েছেন? চির দাসত্বে! তাই প্রভু যে ভাষা লিখ্‌তে বলবেন, যে রকম পরিচ্ছদ পরতে আদেশ করবেন, যখন যেখানে যে ভাবে বসিয়ে কিম্বা দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বেন দরিদ্র দাসকে মাথা নীচু করে তাই করতে হবে; এমন কি চিন্তা করবার স্বাধীনতা যা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার এবং সখ্য, বাৎসল্য মাধুর্য্য ভাবের অনুশীলন যা সৃষ্টিতে একমাত্র মানুষেরই মনে আছে তাও দরিদ্র দাসের নেই;

তাই মনে হয়, দরিদ্রগণ চাইছেন একটা প্রকাণ্ড, এডেন হতে ডিব্রুগড় ব্যাপী যন্ত্র নয়, যার পরিণামে জগজ্জননীর প্রতিনিধি রমণীও তাঁর নারীত্ব স্বাতন্ত্র এবং স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়েও দুঃখিত হয়েন না, দরিদ্রগণও তাঁদের মধ্যে করুণাময়ীর প্রকাশ দেখ্‌তে পান না; তাঁরা চাইছেন এমন একটি সত্যবস্তুর সাধনা যার পরিণামে তাঁরা রূপ, যশ, জয় নিজের দুখানা হাতের ব্যবহারে পেতে পারেন। তাঁরা কোনো কালেই অলস, কর্ম্মে বিমুখ নন; কিম্বা মন ঝিমিয়ে পড়ে যে সব আমোদে তার পক্ষপাতীও নন। তাঁদের কাঁধের শক্তির উপরই না ব্যুরোক্রেসী যন্ত্রটা মাথা উঁচু করে রয়েছে। আপনি যা পূর্ব্বে বলেছেন—

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি" দরিদ্রগণের ইহাই প্রার্থনা বটে কিন্তু দু একজন অত্যন্ত দরিদ্রদের সত্যনিষ্ঠা দেখে মনে হয়েছে তাঁদের আর একটা প্রার্থনা আছে—

তনয়ে তার' তারিণি।

স্বরাজ আন্দোলনটি কি এখন পোলিটিকাল গণ্ডীর ভিতরেই আছে! আমার সন্দেহ হয়; কেন না সকল দেশের পলিটিক্‌সই

রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা রক্তসর্ব্বাঙ্গভূষণা
রক্তায়ুধা রক্তনেত্রা রক্তকেশাতিভীষণা
রক্তদন্তিকা

দেবীর পূজা অল্প বিস্তর করে থাকে। কিন্তু স্বরাজ লাভ করতে হবে বিন্দুমাত্র রক্তপাত করে নয়; নন্‌ভায়োলেন্ট। এই নন্‌ভায়োলেন্ট মন্ত্র যে মনীষি প্রচার করেছেন, সেই মহাত্মা গান্ধী যে আরও একটু এগিয়ে শীঘ্রই বলবেন প্রেম, ভক্তি, মানুষকে যন্ত্রের শাসন হতে

উদ্ধার করবার জন্যে চাই মানুষের সহিত সহযোগিতা; ইহা আমরা অনুমান করতে পারি। বাংলার এবং ভারতবর্ষের মনীষিগণ মহাত্মা গান্ধীর নিকট হতে এ দাবী করছেন; আমাদের আশা আছে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন এই আস্তিকতার দিকটা আগামী কংগ্রেসে সুস্পষ্ট করে তুলবেন।

কেন না, তাঁরা জানেন আত্মা তাঁর স্বভাবে নির্গুণ, নির্বিকার হলেও প্রকাশের সময় সগুণ, স-অবয়ব মানুষের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকেন। দরিদ্রের মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁকে আমরা যত নিরীহ ভাবি, ইতিহাসে দেখা যায়, যে তিনি সত্যই তত নিরীহ ন'ন। মনুষ্যত্ব হতে বঞ্চিত করে, বেশি মজুরীর লোভ দেখিয়ে রাম শ্যামের মুখ বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু দ্বাদশসূর্য্যের তেজও যে-আত্মার তেজের কাছে কিছুই নয় সেই আত্মার আবির্ভাব বন্ধ করা ত যন্ত্রের মালিকের এলাকার বাহিরে। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও আত্মার বাহিরে নন। ঐ আত্মার আবির্ভাবে এই সেদিন য়ুরোপ থেকে মধ্যযুগের শেষ চিহ্ন তিন্ তিনটে জাঁকাল যন্ত্র চুরমার হয়ে গেল; ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে এখনও আছে মাথা উঁচু করে তার কারণ ইংরাজের সঙ্কল্পে দৃঢ়তা এবং ভারতবাসীর আত্মত্যাগ। যে ভারত আত্মত্যাগের দ্বারা আত্মপ্রকাশ করেছেন তিনি যে লোকক্ষয়কর্ত্তা কালরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন না তার স্থিরতা কি? এখন আমাদের স্বার্থ যেন কাল রূপে প্রকাশ না হয়ে, আনন্দরূপে, অমৃত রূপে প্রকাশ পান। স্বরাজ আমাদের পেতেই হবে প্রেমে, সেবায় ভক্তিতে; যন্ত্রের সাহায্যে নয়, যন্ত্রীগণের সহিত সহযোগীতায়।

'সবুজ-পত্রের' এতে ভয় পাবার কিছুই নেই বরং আশা করবার অনেক আছে। যদি সত্যের কাছাকাছি গিয়ে থাকি, তা হলে চিঠিখানি প্রকাশ করে বাধিত করবেন; দরিদ্রদের অভয় দান করবেন। ইতি—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

উড়ো চিঠি

—:*:—

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯২১।

চিনু—

বার বার তুমি আমাকে আঘাত করতে পেরেছ বলেই যে আমি তোমাকে বড় বলে' মান্‌ব তা নয়। গত পাঁচ ছ বছরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আওতায় কোন কোন ইংরেজ আমলাও আমাদের আঘাত করেছে কিন্তু তাই বলেই এ-কথা মান্‌ব না যে ইংরেজ জাতি আমাদের চাইতে বড়। অবশ্য তুমি এ-কথার উত্তরে প্রশ্ন করবে যে তবে কি ব্রিটিশ নেশন আমাদের চাইতে ছোট। যে-নেশনের দু' চার লাখ লোক আমাদের তেত্রিশ কোটী নর নারীকে হাতের মুঠোর মধ্যে দেড় শ' দু' শ' বছর রাখতে পেরেছে তারা যে আমাদের চাইতে ছোট এ-কথা মনে করতে হ'লে যে-রকম আধ্যাত্মিক সাল্‌সা উদরস্থ করা দরকার সে-রকম আধ্যাত্মিক সাল্‌সাকে আমি চিরকাল এড়িয়ে এসেছি। যে আধ্যাত্মিক সাল্‌সা মানুষের কর্ম্ম করবার রোখ বাড়ায় না কেবল কল্পনা করবার ঝোঁক বাড়ায় তেমন আধ্যাত্মিক সালসার প্রতি আমার কোনদিন অনুরাগ ছিলও না আর কোনদিন যে সে-অনুরাগ হবার সম্ভাবনা আছে তা-ও নয়। আত্ম-প্রতারণার আরাম পেতে হ'লে যতখানি অন্ধ সাজা দরকার ততখানি অন্ধ আমি কোন দিনই সাজ্‌তে পারি নি। জীবনের বিচিত্র প্রকাশে যা সার্থক হ'য়ে ওঠে না তার প্রতি আমার প্রাণের টান

কোনদিনই নেই। আমার বিশ্বাস জীবন আছে প্রকাশের জন্য নির্ব্বাণের জন্য নয়। জীবনের এই ধর্ম্মই আমার কাছে সবার চাইতে বড় আধ্যাত্মকতা। এ-থেকেই বুঝ্‌তে পার যে যে-ইংরেজের কর্ম্ম ও চিন্তা সারা জগতে ছড়িয়ে গিয়েছে, যাদের জীবনের প্রকাশ অনিবার্য্য হ'য়ে চারিদিকে ফুটে উঠেছে সে-ইংরেজ আমাদের চাইতে ছোট এ-কথা মনে করবার মতো মনের ভঙ্গী আমার নয়।

তবে আমার শুধু এইটুকু বলা উদ্দেশ্য যে ইংরেজ জাত আমাদের চাইতে বড় কিন্তু সেটা তারা ঐ আঘাত কর্‌তে পারে বলে' একেবারেই নয়। বরং আমাদের মতো দুর্ব্বলকে তারা যে পরিমাণে আঘাত করেছে ও করবে ঠিক সেই পরিমাণেই তারা ছোট হয়েছে ও হবে। এ-কথাটাকে শুধু দুর্ব্বলের সান্ত্বনা বলে' ধরে' নিও না। ওর পিছনে এম্‌নি একটী অনিবার্য্য সত্য আছে যার হিসেব দু' এক দিনে খুব বড় না হ'তে পারে কিন্তু দু' দশ বছরে বিশ ত্রিশ বছরে তা চোখে পড়বেই।

এ-কথাটা সত্যের খাতিরে আমি বল্‌তে বাধ্য যে তুমি ইচ্ছে ক'রে জেনে শুনে আমাকে আঘাত করেছ কি না তা আমি জানিনে সুতরাং সে-অভিযোগও আমি তোমার বিরুদ্ধে আন্‌তে পারিনে কিন্তু আঘাত যে একটার পর একটা করে' আমি পেয়েছি তাও ঠিক। তুমি ইচ্ছে করে' যে সে-সব আঘাত করনি তাতে যে তার বেদনা কিছু কম তীব্র ও কম নিষ্ঠুর হয়েছে তা নয়। এত কথা যে তোমায় আমি আজ বল্‌ছি তার কারণ আজ আমার কোন দুঃখ নেই ক্ষোভ নেই—বরং ও ব্যাপারের লাভের দিকটাই আজ আমার চোখে পড়ছে। যে-দুঃখের বোঝা পাহাড় হয়ে বুকে নেমেছিল

যে-বেদনা অশ্রু-সাগর হ'য়ে দু'চক্ষু অন্ধ করে' তুলেছিল তাও ত গেল। কিন্তু তা রেখে গেল এমন একটা মঙ্গল যা হাজার হাসি গানের ভিতর দিয়ে লব্ধ হ'তে সহস্র যুগেও পারত না। তাই আজ ভাবি যে আঘাত না পেলে—দুঃখের আঘাত না পেলে—মানুষ মানুষ হয় না। দুঃখই মানুষকে আত্মস্থ হ'তে শেখায়—নিজের অন্তরের দিকে ফেরায়। তোমার দেওয়া আঘাতের পর আঘাতে আমাকে সেই দিকেই ফিরিয়েছে। এত বড় একটা মঙ্গল তুমি আমাকে দান করেছ। তাই আজ আমি তোমাকে আমার আন্তরিক নমস্কার জানাচ্ছি।

আজ আমার মনে পড়ছে সে-দিনের কথা যে দিন তুমি নৌসেরাতে আমাদের মাঝে গিয়ে পড়লে। আমরা তিনজন হাবিলদার লেফ্‌টেনাণ্ট্ রায়ের সঙ্গে messing করবার অনুমতি পেয়েছিলুম। লেফ্‌টেনাণ্ট্ রায়ের সঙ্গে আমাদের তিন হাবিলদারেরই কলেজ-অবস্থা থেকে পরিচয়—আমার সঙ্গে তার একটু বেশী ও বিশেষ বন্ধুত্বই ছিল। আমরা একটা ছোট্ট বাড়ী পেয়েছিলুম, সেই বাড়ীতে আমরা চারজনে থাক্‌তুম। তুমি সেইখানে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে না হলেও—যুদ্ধক্ষেত্রের নেপথ্যেত বটে, অসংখ্য গোলাগুলির মাঝে অবিরাম বারুদের গন্ধের মাঝে, সকাল সন্ধ্যে কুচ-কাওয়াজের মাঝে, মানুষকে হত্যা করবার জন্যে তৈরী-হবার সাধনার মাঝে গিয়ে উদয় হয়েছিলে একেবারে ভগবানের সহজ কৃপাশীর্ব্বাদের মতো। আমার কি মনে হয়েছিল জান? মনে হয়েছিল যেন দুরন্ত মরুভূমির লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী শুষ্কবক্ষ বালুকণার হৃদয় বিদীর্ণ করে' হঠাৎ এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আকাশে উঠে আপনার নিবিড় সুশীতল ছায়ার মায়া-

অঞ্চল দিয়ে যেন চারিদিকে ঘিরে দিলে। সহস্র সহস্র লোক এখানে মর্‌বার জন্যে মারবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কি শৌর্য্য, কি বীর্য্য, কি গৌরব! কিন্তু ওর যেন কিছুই সহজ নয় স্বতঃ নয়। সবার চোখেই যেন কি একটা সঙ্কোচের রেখা অস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে আছে। বাইরের শত ঝন্‌ঝনা শত মূর্চ্ছনা কিছুতেই সেটাকে মুছে ফেল্‌তে পারেনি। সেই সহস্র সহস্র শক্তিমান শোণিতাকাঙ্খীর মাঝে তোমার উদয় যেন একটা দুর্নিবার সহজত্ব নিয়ে—একটা দুর্ব্বার কৃপাপরশ নিয়ে—মূর্ত্তিমান শুভ্রতা ও শুচিতা নিয়ে। যেন লক্ষ লোকের কোষের তরবারী ও কাঁধের বন্দুকের লজ্জা আর সেদিন আত্মগোপন করে থাক্‌তে পারল না। যেন উত্তোলিত রুদ্র খড়্গের কোপের সাম্‌নে বিস্তৃত হল ক্ষুদ্র শিশুর ফুলের মতো কচি অকল্যান-জ্ঞানহীন হাত দুখানি। উত্তোলিত খড়্গ নাম্‌ল বটে কিন্তু সে হিংসায় নয় রোষে নয়—লজ্জায় ও অশ্রুধারায়।

আমি স্বেচ্ছায় যখন সৈনিক হয়েছি তখন যুদ্ধ ব্যাপারটার প্রতি যে আমার আন্তরিক অনুরাগ একটুকুও নেই এ-কথা সত্য করে' বলা চলে না—এবং ঐ কারণেই মানুষ হত্যার প্রতি যে আমার ভীষণ বিরাগ আছে তা বলেও শপথ করা চলে না। কিন্তু সেদিন নৌসেরাতে তোমার আবির্ভাবে যে-সব ভাব আমার মনে প্রাণে উদয় হয়েছিল সে-সবও যে একেবারে মিথ্যারই কুহক এ-কথাও ত মান্‌তে পারলুম না। আজকাল পৃথিবীতে জাতি-মণ্ডলীর যে-অবস্থা তাতে সমাজের জন্য অস্ত্রধারণ যত প্রয়োজনীয়ই হোক্ না কেন, মানুষের সবার চাইতে বড় আনন্দলাভ ত অস্ত্রত্বের ভিতর দিয়ে নয়। এই যে জগতব্যাপী লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বুভুক্ষিত

নরনারী—যাদের ধন আছে জন আছে সম্পদ আছে বিভব আছে তবুও যারা বুভুক্ষিত—তাদের এ-ক্ষুধা মিট্‌বে কি কেবল হত্যায় ও হরণে? নৌসেরাতে সেদিন তোমার আবির্ভাবে দুটী ছবি আমার চোখে পাশাপাশি ফুটে উঠ্‌ল—একটা রুদ্রের তাণ্ডব নর্ত্তনের মতো, যেন আপনার অশান্তিতে আপনি পীড়িত—আর একটা শান্ত সমাহিত আত্মবান সৌন্দর্য্যের মহিমা—যা নিজের মধ্যেই নিজেকে সার্থক করে' তুল্‌ছে। আমার সৈনিক-জীবনকেও ঐ শেষের ছবিটীই আকর্ষণ কর্‌লে। এতকাল আমি রুদ্রের ভ্রূকুটীর সামনেও শির উন্নত করেই চলেছিলুম কিন্তু ঐখানে আমি অন্তর নত না করে' পারলুম না। এ নত-হওয়া ত আমাকে অপমান দিয়ে আবৃত কর্‌ল না—আমাকে মণ্ডিত কর্‌ল আনন্দের মহিমা দিয়ে।

তাই সেদিন আমি অস্ত্র-ঝন্‌ঝনা বারুদের গন্ধ ইত্যাদির মাঝে থেকেও এমন একটা জগতের সন্ধান পেলুম ও সত্তা অনুভব কর্‌লুম যে-সত্তা রুদ্রের সত্তার চাইতে কত বড় ও কত বেশী সত্যময় সৌন্দর্য্যময় ও আনন্দময়। আমার মনে হ'ল সারা বিশ্ব যদি ঐ জগতে উঠে যায় ঐ সত্তায় রূপান্তরিত হ'য়ে যায় তবে সেটা বিশ্ব-মানবের যে কি মহাম্ লাভ সেটা অঙ্ক কসে' দেখান যায় না। তবে সেটা কোনদিনও ঘট্‌বে কি না তা কেবল এক সেই পরম লীলাময়ই জানেন।

তুমি বাঙালীর মেয়ে, নারী-সংস্পর্শ-শূন্য পুরুষের জীবন-যাপন-ইংরেজিতে যাকে বলে Bachelor's life—তা দেখ্‌বার সুযোগ তোমার কোনদিন হয় নি। কেননা ঐ Bachelor বলে' জিনিসটা বাঙালীর সমাজে বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কারণ ওখানে

সবাইকে বিয়ে কর্‌তেই হবে—এবং সবাই বিয়ে করেও থাকেন তা স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনের সামর্থ্য থাক্ আর নাই থাক্। কিন্তু ঐ যে আমরা তিনটী হাবিলদার তোমার স্বামির সঙ্গে নৌসেরাতে এক বাড়ীতে থাকতুম সেখানে আমরা যেভাবে দিন কাটাতুম সেটা ছিল এই রকম একটা ব্যাপার যে-ব্যাপারটা ডন্-কুইকসোটের সঙ্গে পিক্‌উইকের এবং ঐ দুয়ের সঙ্গে Three musketeersএর Heroকে মেশালে যা দাঁড়ায় তাই। চার মাসের ছুটীতে আমরা ছিলুম military decipline এর বাইরে—আর তখন আমাদের ছিল "ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর" "রাত কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি"—অবস্থা। খাওয়া ঘুমোনো ব্যাপারগুলো হ'য়ে উঠেছিল এম্‌নি বেহিসেবী যে তাকে devil's delirium ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। বঙ্কিম শান্তির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—"এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে হরে মুরারে"—আমাদেরও তখন ছিল ঐ কথা "এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?" কিন্তু তার পিছনে ছিল না ঐ "হরে মুরারে।" জীবনের রাশ এমন করে' নিশ্চিন্ত হয়ে অনিশ্চিতের মাঝে ছেড়ে-দেবার সুযোগ ও প্রবৃত্তি আর কারো কোথাও হয়েছে কি না জানিনে যেমন হয়েছিল আমাদের এবং আমরা সে-সুযোগের একটুও অসম্মান করিনি। এই রকম যখন আমরা চারজন আমাদের জীবনকে উধাও করে' ছেড়ে দিয়ে বসে' ছিলুম তখন তুমি আমাদের সেই অশান্ত উদ্দাম লীলার মাঝে উদিত হ'লে একেবারে মূর্ত্তিমতী শান্তির মতো।

তোমার আবির্ভাবে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলুম যে আমাদের ভিতরে এবং বাইরে কেমন একটা সহজ সংযম ও শিষ্ট শৃঙ্খলা জেগে উঠল—যে-সংযম যে-শৃঙ্খলার জন্যে আমাদের কারো কোন কষ্টও

কর্‌তে হয় নি কৃচ্ছ্রতাও করতে হয় নি। সেটা এমনি স্বতঃ হ'য়ে দেখা দিল যে মনে হ'ল আমাদের আগের জীবন ইতিহাসকে ছাড়িয়ে একেবারে প্রত্নতত্ত্বের অধিকারভুক্ত হ'য়ে পড়েছে।

তাই আমার মনে হয় যে পুরুষ হচ্ছে জন্ম-জন্মান্তরের এনার্কিষ্ট—এনর্কিজম্ তার গিঁঠে গিঁঠে স্নায়ুতে স্নায়ুতে উদ্দাম চাঞ্চল্য নিয়ে উন্মুখ হ'য়ে আছে—আর নারী হচ্ছে তার প্রতিষেধক। পুরুষ যেন বর্ত্তমানকে ভোগ কর্‌তে চায় তার সর্ব্বস্ব দিয়ে কিন্তু নারীকে যেন ব'য়ে চল্‌তে হচ্ছে অতীতের সমস্যা ও ভবিষ্যতের মীমাংসাকে। পুরুষের জীবনের যা-কিছু স্থায়ী তা সে লাভ করেছে নারীর সংস্পর্শ ও সংসর্গ গুণে। সন্ন্যাসীর অভাব নেই কিন্তু সন্ন্যাসিনী বিরল।

নারীর সংস্পর্শে যেমন পুরুষের মন শিষ্ট ও সভ্য হ'য়ে ওঠে নারীর সংসর্গে পুরুষের কর্ম্মও তেম্‌নি প্রয়োজনের হ'য়ে ওঠে। মানুষের সভ্যতার ঐ দুটোদিক—একদিকে সংযম আর একদিকে প্রয়োজন। ঐ দুটোই পুরুষ পেয়েছে নারীর কাছ থেকে নারীরই প্রয়োজনে। বিশ্বমানবের সভ্যতায় প্রত্যক্ষভাবে নারীর হাত তেমন না দেখা গেলেও পরোক্ষ যে প্রভাব সেখানে তার আছে তা নিতান্ত অপ্রত্যক্ষ নয়। আসলে একটু তলিয়ে দেখ্‌লে দেখা যায় মানুষের সমাজের আসল গ্রন্থিই হচ্ছে নারী। নারীকেই ধরে' নারীকেই কেন্দ্র করে' সমাজ আকার নিয়েছে। নারী না থাক্‌লে পুরুষের জীবনের ভঙ্গিমা যে কি-রকম হত সেটা একটা মস্ত interesting গবেষণা। পুরুষ হচ্ছে যেন centrifugal force আর নারী, centripetal; ঐ centripetal forceএর গুণেই সমাজ দানাবেঁধে উঠেছে ও মানুষের সভ্যতা নিরাকার থেকে যায় নি।

সে যা হোক্ তুমি নৌসেরায় ত এলে—এসে সবার প্রথমে এই জিনিষটা আবিষ্কার কর্‌লে যে সেখানে তোমার সময় কাটাবার উপাদান ও উপকরণের নিতান্ত অভাব। দেশে নিশ্চয়ই তোমার সময় কাটত কতকটা ঘর কন্নার ব্যাপার নিয়ে আর কতকটা সঙ্গিনী-দের সঙ্গে গান গল্প হাসি তামাসা করে' কিন্তু নৌসেরাতে অবশ্য গিয়ে দেখলে সে-সব করণ উপকরণ অধিকরণ সেখানে কিছুই নেই। এক ছিল বই পড়া; কিন্তু সেই God forsaken নৌসেরাতে বই পাওয়াই এক বিষম ব্যাপার আর বই পেলেও একটা মানুষ আর কিছু রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা বই নিয়ে থাক্‌তে পারে না। আর এক ছিল আমাদের সঙ্গে গাল গল্প করা কিন্তু আমাদের মেয়ে পুরু-ষের মনের মধ্যে এমনি একটা gulf জেগে উঠেছে যে সে gulf এর ওপরে সাঁকো না বেঁধে আর গাল গল্প চলেই না—বলা বাহুল্য সে অবস্থায় সেটা তেমন জমাট বাঁধে না। বিশেষতঃ আমাদের মেয়েদের মানস জগৎ এখনও এম্‌নি সীমাঘেরা আছে যে আধঘণ্টা কথা কইলে সে মনের সব কথা বলা হ'য়ে যায় আর নতুন কিছু বলবার থাকে না।

তোমার তিনমাসের প্রবাসে একটী বাঙ্গালী কিশোরী তরুণীর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ ও সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুবিধা হ'ল। বলা বাহুল্য আমাদের সমাজের যে অবস্থা ও যে ব্যবস্থা তাতে করে' এ-সুযোগ কারোই ঘটে ওঠে না। আমরা দেখতে পারি একমাত্র আমাদের নিকটতম আত্মীয়াদের। বলা-বাহুল্য সে আত্মীয়াদের আমরা দেখি কেবল চোখ দিয়ে, মন দিয়ে নয়। আর কিশোরী তরুণীকে দেখবার সুযোগ ঘটে বিবাহিতের, কেবল মাত্র তার স্ত্রীকে। সেও শুধু

শয্যাপ্রান্তে ও নিদ্রালস নয়নে, অবগুণ্ঠিতা ও সঙ্কুচিতা। আমা-দের মেয়েদের জীবনের যে-সময়টাতে সবার চাইতে আলো বাতায় বেশী দরকার ঠিক সেই সময় থেকেই তা থেকে তারা বঞ্চিত হ'তে থাকে। প্রচুর আলো বাতাসের রসদ পায় না বলে' তাদের জীবনের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি হয় একটা মহা কৃত্রিমতার ভিতর দিয়ে তাদের সবারই হয় stunted growth. এই জন্যে তারা সমাজে সৌন্দর্য্য সৃষ্টিও কর্‌তে পারে না বা প্রাণ শক্তিও চারিয়ে দিতে পারে না। আমাদের মেয়েরা আমাদের পুরুষদের মনকে রঙিন্ করে' তুল্‌তে পারে না কেবল তাদের দেহের ধর্ম্মকে সঙীন করে' তোলে। আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আমাদের মেয়েরা তাদের প্রাণ-ধর্ম্মকে সজীব করে তুল্‌তে পারছে না।

ঐ-প্রাণ না হলে কিন্তু চলে না কেননা আমরা সবাই আছি প্রাণী-জগতে। আমাদের বাঁচবার পক্ষে বাড়বার পক্ষে প্রাণ অপরিহার্য্য। তুমি হঠাৎ দার্শনিক হ'য়ে উঠে বলে' ফেল্‌তে' পার—মানুষের প্রাণটা হচ্ছে ছোট জিনিস নীচের স্তরের তার আসল জিনিষ হচ্ছে আত্মা। আত্মা আসল ত বটেই কিন্তু মনে রেখো প্রাণ জিনিসটাও নকল নয়। ঐ প্রাণ বাদ দিলে যে আত্মা প্রেতাত্মাতে দাঁড়ায় সেটা দেখতে হ'লে হেলিগোল্যাণ্ডে যেতে হয় না। পলিটিক্যাল অবস্থার দরুণ আমাদের পুরুষদের প্রাণের ছুটবার পথ নেই আর সামাজিক ব্যবস্থার খাতিরে আমাদের মেয়েদের ও-বস্তুর ফুটবার উপায় নেই। তার উপর আছে আবার আধ্যাত্মিক সালসা। আর ও সালসার এমনি গুণ যে ওর কয়েক ফোঁটা পেটে পড়তেই আমরা দর্শনেন্দ্রিয় হারিয়ে দার্শনিক সাজি ও আত্মাকে হারিয়ে আধ্যাত্মিক বনি।

আমাদের মেয়েরা যে কুড়িতে বুড়ি বনে' যায় আমার মনে হয় তার প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের প্রাণের ধর্ম্মের উপরে সমাজ-বুড়োর ও আচার-বুড়ীর মস্ত চোখ-রাঙানীটা। জীবনে সংযমের যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে এটা কেউ-ই অস্বীকার করবে না। কিন্তু জীবন যেখানে আছে সেই খানেই সংযমের সার্থকতা যেখানে কেবল মৃত্যু সেখানে ও-বস্তুর কোন অর্থই নেই। যা হোক্ যে সমাজে মায়ের জাত কুড়িতে বুড়ি হয় সে সমাজের ছেলেদের আয়ু যে ত্রিশ চল্লিশের মাঝামাঝি এটা নিতান্ত অন্যায় নয়।

কিন্তু সেদিন নৌসেরাতে আমরা একটি বাঙ্গালী মেয়ের ভিতরে কি রকম প্রাণ শক্তি থাকার সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে তার পরিচয় পেলুম। আমি তোমাকে তোমার বিয়ের পর দু'একবার দেখেছি কিন্তু সে বাঙালী পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে। কিন্তু সেই নৌসেরাতে যেখানে কোন সমাজই নেই আমাদের কারো তর্জ্জনীর শাসন নেই, কারো চোখের ভ্রূকুটী নেই সেখানে তোমার যে-মূর্ত্তি আমি দেখেছিলুম তোমার মধ্যে সে-মূর্ত্তির সম্ভাবনাকেও যে কল্পনা করতে পারি নি। দেখেছিলুম প্রাণের একটা অতি সহজ অতি স্বতঃ গতিভঙ্গিমা লীলাতরঙ্গ যা চারিদিকে আলোক আর সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে আপন মনেই ছুটে চলেছিল। যেন স্রোতস্বিনী যা পাহাড়ের পাষাণ কারার মধ্যে কত যুগ গুমরে গুমরে মরছিল তা হঠাৎ ছাড়া পেয়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। যেন কত যুগের বদ্ধ বায়ুতে রুদ্ধ প্রাণ ছাড়া পেয়ে সুদ সুদ্দ আপনার প্রাপ্য আদায় করে' নিচ্ছে। যেন হাজার বছর ধরে' যে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে তার সমস্তটা একটা ক্ষুদ্র দিনে ক্ষুদ্র হাতে

সে আপনার করে নিতে চায়। আমি সেদিন তোমার মধ্যে যেন বাঙ্গালী জাতির সমস্ত তরুণী-সমাজের হাজার বর্ষ-ব্যাপী ব্যর্থ-হয়ে-থাকা ধর্ম্মের ও মর্ম্মের চেহারা দেখলুম। আমার মনে হ'ল আমরা ত আমাদের নারী-সমাজকে হত্যা করে করেই চলেছিলুম। এ-হত্যায় রক্তপাতের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না বলে' যে তা কম পাপের তা নয়। এ-পাপের বিচার সমাজের বিচারালয়ে হয় না বটে কিন্তু জীবন-দেবতার মন্দিরে যে এ-বিচার অবিরাম চল্‌ছে। সেদিন আমার চোখের সামনে একটা revelation হ'য়ে গেল। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম—কিন্তু সে তোমার দৈহিক সৌন্দর্য্যে নয়, তোমার ঠোঁটের হাসিতে নয়, তোমার চোখের কটাক্ষে নয়—সে তোমার ঐ প্রাণের লীলার সঙ্গীতে। সেদিন যেন একটা জীবন্ত প্রাণ সাবয়ব হ'য়ে আমার চোখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গেল। মনে হ'ল এমন কোন কল্যাণ থাক্‌তেই পারে না যা এই প্রাণকে নষ্ট করবার ক্ষতিপূরণস্বরূপ দাঁড়াতে পারে।

সেদিন আমি স্পষ্ট দেখলুম, এই যে নারী-সমাজের চারিদিকে একটা কঠিন দেয়াল খাড়া করে' তোলা হয়েছে তার পিছনে আছে আমাদের পুরুষ-সমাজের একটা বিরাট কাপুরুষতা। এ কাপুরুষতা উদ্ভূত হয়েছে সামর্থ্যহীন অহঙ্কার থেকে। সামর্থ্যহীন অহঙ্কারের ধর্ম্মই হচ্ছে আপনাকে রক্ষা করা negativism দিয়ে। জীবন-সংগ্রামে তার লাফিয়ে পড়বার সাহস নেই জীবন-সংগ্রামকে তাই সে বাইরেই রেখে দেয়। জাত বাঁচাতে হ'লে সে আর সবাইকে অস্পৃশ্য করে তোলে। এর ভিতরের কথাটাই হচ্ছে এই যে সামর্থ্যহীন অহঙ্কারের আপন আপন ধর্ম্মের উপরে তেমন বিশ্বাস নেই তেমন আস্থা নেই। ধর্ম্ম কথাটা এখানে আমি সংস্কৃত

অর্থে ব্যবহার করছি। যেখানে আত্ম-বিশ্বাস রয়েছে যেখানে আত্ম-প্রত্যয় এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নি সেখানে "শিক্ষার মিলনে" ভয় থাকে না বরং মনে হয় শিক্ষার মিলন আত্মাকেই আরো পুষ্ট করবে সম্পদশালী করে তুল্‌বে। কিন্তু "শিক্ষার বিরোধ" আমরা সেই-খানেই গড়ে তুলি যেখানে মনে করি পরের চিন্তার ধাক্কায় কর্ম্মের ধাক্কায় আমরা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারব না আমাদের একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। জার্ম্মাণীতে সংস্কৃতের চর্চ্চা হয় এবং বেদ বেদান্তের আলোচনা হ'য়ে থাকে কিন্তু সেখানে এ-প্রশ্ন কোনদিন ওঠে না যে ও-শিক্ষা তাদের শিক্ষার বিরোধ কি না। ও-প্রশ্ন ওঠে নি কেননা ও-রকম কোন প্রশ্নই নেই। আসলে শিক্ষার বিরোধ বলে' কোন বিরোধ নেই যে-বিরোধটা আছে সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল ন্যাশানালিজ্‌ম্‌এর। শিক্ষার বিরোধকে মেনে নেওয়ার অর্থ আত্মাকে ছোট করে' দেখা, আত্মার সামর্থ্যহীনতা ও পরাজয় স্বীকার করে' নেওয়া।

মুসলমানী যুগের non-touchism আমাদের আত্মার দৈন্যই ঘোষণা করেছে'। আত্মার দৈন্য যখন ছিলই তখন non-touchism হয়ত আমাদের উপকারেই লেগেছে। কিন্তু আজ এই ইয়োরোপীয় যুগে ঐ non touchismকেই যে আমরা জীবন-বেদের ভিত্তি বলে' মানছি নে সেটা এরি চিহ্ন যে আমরা আমাদের আত্মার দৈন্যাবস্থা কাটিয়ে উঠ্‌ছি। নিজের মধ্যে যখন জোর পাই তখনই পরের সঙ্গে কোলাকুলি কর্‌তে ভয় পাইনে।

এই যে non-touchism এ কিসের নামে? ধর্ম্মের নামে। ডাক্তারদের কাছে যেমন কুইনাইন আমাদের কাছে তেমনি ধর্ম্ম।

ও Politics বল Cow conference বল, ও Afgan invasion বল বা Everest Expedition বল সব সম্বন্ধেই আমরা মুখ খুলি ধর্ম্মের নামে। এ ধর্ম্ম কিন্তু সংস্কৃত অর্থে নয় ইংরাজি অর্থে। তার কারণ সংস্কৃত আমরা জানিনে সুতরাং ওর সংস্কৃত অর্থও আমরা জানিনে কিন্তু ইংরাজি জানি সুতরাং ওর ইংরেজি অর্থও জানি। ওর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে আমাদের সকল কাজে আত্মার পুণ্য সঞ্চয়ের প্রতি যতটা লোভ জাগে দেহের পুষ্টি সাধনের দিকে ততটা দৃষ্টি পড়ে না। ওর ফলে স্বর্গরাজ্যের প্রতি আমাদের যতটা দৃষ্টি পড়ে মর্ত্ত্যলোকের প্রতি ততটা মন পড়ে না। কিন্তু মর্ত্ত্যশক্তি আয়ত্ত না করেও মানুষের অমৃতত্ব লাভ হয় কিনা জানিনে কিন্তু মৃত্যু যে লাভ হয় তার প্রমাণ ভারতবাসীর ঘরে বাইরে পড়ে আছে।

মুসলমানী যুগে মুসলমানকে অস্পৃশ্য করে' তুলেছিলুম আমরা ধর্ম্মের নামে আজ আবার দেখছি তাকে স্পৃশ্য না করে' তুল্‌লে চলে না কেননা নইলে আমাদের পলিটিক্স অচল হ'য়ে পড়ে। এই অস্পৃশ্যতার ফলে কত শতাব্দী ধরে' হিন্দু মুসলমানের অন্তরে যে বদ্ধমূল ভেদবুদ্ধি শিকড় গেড়েছে এমন কোন্ পলিটিয়ান আছেন যাঁর আজ লোভ না হয় সেই ভেদবুদ্ধির শিকড়কে একটানে সমূলে উৎ-পাটিত কর্‌তে। কিন্তু যে-রস সঞ্চিত হয়েছে শতাব্দী ধরে সে রস যে শুকিয়ে যাবে এক পহরে তা নয়। অতীত কর্ম্মের ফল ভোগ আমাদের কর্‌তেই হবে তা সে বর্ত্তমানের প্রয়োজনের তাড়া যত জরুরীই হোকনা কেন।

যে-অবস্থায় পড়ে' যে-অভিমানে অভিমানী হ'য়ে একদিন আমরা মুসলমানকে অস্পৃশ্য বলে' ভেবেছিলুম আজ আবার ঠিক সেই

অবস্থায় পড়ে' সেই অভিমানে অভিমানী হ'য়ে ইয়োরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞানকে অপবিত্র বলে' মেনে নেবার চেষ্টা করছি। ওর ফলে যে কেবল আমাদের জাতীয় মনই শুচিবাইগ্রস্থ হ'য়ে উঠবে তাই নয় এ সম্ভাবনাও থাক্‌বে যে মানুষের বড় প্রয়োজনের পথে ওটা একদিন একটা মস্ত বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে আমরা আদার ব্যাপারী হ'য়ে যেটার সম্ভাবনাকে কল্পনাও কর্‌তে পারছি নে জাহাজের মালিক হ'য়ে হয়ত আর একদিন দেখব যে সেইটে আমাদের সবার চাইতে বড় পাপের জন্ম দিয়ে বসে' আছে।

লিখতে লিখতে চিঠিটা বড় হ'য়ে গেল আজ এইখানে খতম্। লেফ্‌টেনাণ্ট্ রায়ের সিকিম যাবার কথা ছিল—গেছেন না কি? না গিয়ে থাক্‌লে তাঁকে বোলো আমার কুশল—তাঁকে আর ভিন্ন চিঠি এবার লিখলুম না। সভ্য ও conventional জগতে ফিরে অবধি একটু foreign foreign লাগ্‌ছে। ইতি—

হাবিলদার।

হিন্দু জাতির পরিণাম।

—:০:—

যাঁহারা বলেন যে "সনাতন" হিন্দুজাতি অক্ষয়, অব্যয়, অমর, তাঁহাদের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ লিখিতেছি না। পৃথিবীর সমস্ত জাতির ন্যায় হিন্দুজাতিও জরা ও মৃত্যুর স্বাভাবিক নিয়মের অধীন ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই বিবেচনার জন্য, এই "জাতীয়তার" দিনে কয়েকটী কথা বলিতে অগ্রসর হইতেছি।

"হিন্দু" কথাটা অনেক কলহের কারণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন রঘুনন্দনের ব্যবস্থিত শৌচাশৌচ ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণয় সমন্বিত স্মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া পি, এম, বাগ্‌চির পঞ্জিকান্তর্গত "শুক্‌নো ডালে ডাকে কা" ও হাঁচিটিক্‌টিকিরহস্য পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় যাঁহারা বরাবর পালন করিয়া আসিতেছেন তাঁহারাই হিন্দু; অপর পক্ষ বলেন যে ভারতীয় আর্য্যঋষিগণের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় চিন্তা ও ঈশ্বরারাধনার নির্দ্দেশ এই দুই বিষয় মাত্র যিনি পালন করিবেন তিনিই হিন্দু এবং বাহ্য আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি শুধু স্বাস্থ্যতত্ত্বের অনুসরণ করিলে তাঁহার হিন্দুত্ব লোপ পাইবে না। আরও সোজা কথায় বলিতে গেলে শেষোক্ত শ্রেণীর মতে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম ও আর্য্য-সমাজীরাও হিন্দু। কিন্তু অপর পক্ষ ইহা স্বীকার করেন না। যাহা হউক, লোক গণনার সময় যাঁহারা নিজেকে হিন্দু বলিয়া লিখাইয়া থাকেন, আমি সোজাসুজি সেই অর্থে হিন্দু শব্দ ব্যবহার করিব।

যাঁহারা হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে এই "জাতীয়

জাগরণের" দিনেও যে দিক হইতে তাহার মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিবার জন্য ব্যাধ শরাসনে শরসন্ধান করিতেছে, হিন্দু সমাজ একচক্ষু হরিণের মত ঠিক সেই দিকেই দৃষ্টিহীন চক্ষুটী মেলিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতেছে। যদি কেহ তাহাকে ডাকিয়া বা খোঁচা দিয়া সতর্ক করিতে চায় তবে সে শিং নাড়িয়া সতর্ককারীকে আক্রমণ করিতে আসে। মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে একটা অমূলক প্রবাদ আছে যে সরস্বতীর কৃপা পাইবার পূর্ব্বে তিনি এত নির্ব্বোধ ছিলেন যে একদা এক ডালের আগায় বসিয়া সেই ডালের গোড়া কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রূপকথা ছাড়িয়া দিয়া সরল ভাষায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে হিন্দু সমাজের কতকগুলি আচরণ লক্ষ্য করিলে অনেকেই একথা বলিতে বাধ্য হইবেন যে এই "সনাতন" সমাজের মতি গতি আত্মধ্বংসকর। যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া হিন্দু স্বরাজ লাভের জন্য বাহবাস্ফালন করিতেছে সেই ভিত্তিই মাটিতে বসিয়া যাইতেছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই।

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি একথা বুঝেন যে সমাজ বা জাতি ঠিক একটী প্রাণীদেহের ন্যায়। প্রত্যেক অঙ্গের পুষ্টি না হইলে যেমন প্রাণীশরীরের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি হয় না, সেইরূপ জাতিরও প্রত্যেক অংশকে উপযুক্ত পুষ্টিদান না করিলে সমগ্র জাতির উন্নতি হয় না। জীবন্ত প্রাণীদেহে যেমন কোন অংশ ব্যথিত হইলে সে ব্যথায় অপর সকল অবয়বই সাড়া দিয়া উঠে কিন্তু মৃতদেহে সেরূপ হয় না, কোন জীবন্ত জাতির পক্ষেও ঠিক সেকথা। ইহার সত্যতা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই বুঝেন, অথচ তাঁহাদের অনেকেরই এ বিষয়ে খেয়াল নাই।

ভারতের সাত কোটি মুসলমান ও তেইশকোটি হিন্দুকে লইয়া ভারতীয় "নেশন" বা জাতি। হিন্দু ও মুসলমানের একতা কাগজে ও বক্তৃতায় একপ্রকার মানিয়াই লওয়া হইতেছে, সুতরাং আমিও সে কথা মানিয়া লইয়া, হিন্দুর কথাই বলিব। তেইশকোটি হিন্দুর মধ্যে প্রাদেশিক প্রভেদ লইয়া বহু থাক্ বা শ্রেণী আছে এবং কোন শ্রেণীর সঙ্গে অপর কোন শ্রেণীর আন্তরিক তত মিল নাই যত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মুসলমানের আছে। বাঙ্গালী মুসলমান বিপদে পড়িলে পাঞ্জাবী বা অযোধ্যার মুসলমানের প্রাণে যত লাগিবে, মৎস্যভোজী বাঙ্গালী হিন্দুর জন্য রুটীভোজী পশ্চিমে হিন্দুর তত দরদ হইবে না। বিবাহাদি ব্যাপারেও তাহাই। হিন্দুর মধ্যে এই প্রাদেশিক প্রভেদ ব্যতীত আরও যে এক ভীষণ বিষমতা আছে, উহাই কিন্তু আরও সর্ব্বনাশের কারণ। এই বিষমতা সকল প্রদেশেই আছে। বাঙ্গালার কথাই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাউক।

সকলদেশেই যাহাদিগকে নিম্নশ্রেণী বলা হয় তাহারাই জাতির প্রকৃত শক্তির আধার। যাহাদ্বারা সমস্ত জাতির অস্তিত্ব বজায় থাকে এমন সমস্ত পরিশ্রমের কার্য্যই নিম্নশ্রেণীর লোক করিয়া থাকে। হাল চালনা, কলে মজুরের কাজ, নৌচালনা, ভদ্রলোকের বাড়ী ঘর, বাগান পরিস্কার সংস্কার ও রক্ষা সাধারণতঃ উহারাই করিয়া থাকে। অথচ ইহারা ধনহীনতার জন্য সকল দেশেই অল্প বিস্তর ঘৃণার পাত্র হয়; কিন্তু আমরা অর্থাৎ হিন্দু উচ্চবর্ণেরা জাত্যাভিমান দ্বারা উহাদের কাটা ঘায় নুনের ছিটা দিয়া উহাদিগকে আরও নির্য্যাতিত করি; ধনহীনতা ভদ্র ও অভদ্রের পার্থক্য মানে না এবং ধনসঞ্চয় দ্বারা নির্ধনতার অগৌরব হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু জাতি সম্বন্ধীয় ঘৃণা

বা বিদ্বেষ যেমন আজীবন কষ্টদায়ক তেমনি মর্ম্মঘাতী। আমি আমার পোষা বিড়ালটাকে বিছানায় লইয়া আদর করিতে করিতে যদি শূদ্র চালের তলে আসিয়াছে বলিয়া জলের কলসী ফেলিয়া দিই, তবে সে মর্ম্মাহত হইয়া যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তবে তাহাকে দোষ দিতে পারি না। সুতরাং ঐ ঘৃণা ষোল আনা মনে পোষণ করিয়া যদি শূদ্রকে "দেশের কাজ উপলক্ষ্যে" ডাকি, আর যদি সে সে-ডাকে সাড়া না দেয় তবেও তাহার দোষ হয় না। এই জন্য বর্ত্তমান "অ-সহ-যোগীতা" নামক নূতন "দেশের কাজে" বাঙ্গালার নমঃশূদ্র-সমাজ সর্ব্বান্তঃকরণে যে যোগ দেয় নাই, সেজন্য সে ততটা দোষী নয়, যতটা উচ্চবর্ণেরা। মাদ্রাজের আদিদ্রাবিড় জাতি কিছুদিন পূর্ব্বে যখন সভা করিয়া উচ্চবর্ণ হিন্দুকে সেনাপতি ডায়ার অপেক্ষাও সহস্রগুণ নিষ্ঠুর বলিয়াছিল, তখন তাহারা এই যুক্তি দেখাইয়াছিল যে একজন ইংরাজ দশ বা পনর দিন কয়েকজন ভারতবাসীকে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে আদেশ দিয়া এবং আরও কয়েকপ্রকারে অপমানিত করিয়াছিলেন, কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দু নিম্নশ্রেণীর লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে সহস্র বৎসর ধরিয়া পদে পদে অধিকতর মর্ম্মান্তিক অবমানে অবমানিত করিতেছেন। উচ্চশ্রেণীরা রুষ্ট হইতে পারেন কিন্তু কথাটার মধ্যে অনেক সত্য আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

হিন্দু সমাজের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আত্মধ্বংসকারী ঘৃণা ও বিদ্বেষ কতদূর বদ্ধমূল তাহা দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যশোর জেলার অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার একটা উকিল নমঃশূদ্র। কিছুদিন পূর্ব্বে তত্রত্য উকিল সম্প্রদায় সভা করিয়া এই স্থির

করিয়াছেন যে (Bar library র) উকিল সভার কায়স্থ জাতীয় ভৃত্য উক্ত নমঃশূদ্র উকিলকে জলপান ইত্যাদি দিলে তাহার আভিজাত্য নষ্ট হইবে, অতএব জলপান দেওয়া বন্ধ হউক। এ ঘটনা অনেক সংবাদ পত্রে আলোচিত হওয়ার পরও নড়াইলের উকীলগণ (দুই একজন বাদে) লজ্জিত না হইয়া বরং দর্পের সহিতই আভিজাত্য গৌরব রক্ষা করিয়া মহা আনন্দ অনুভব করিতেছেন। অথচ ঐ স্থানে দুই একজন মুসলমান উকীল আছেন, তাঁহাদের সেবাদ্বারা কায়স্থ চাকরের "জাতি "নষ্ট বা কলুষিত হওয়ার আশঙ্কা কেহ করেন নাই; "জাতি" যায় হিন্দু নমঃশূদ্রকে পান তামাক দিলে। শুনা যায় ঐ উকিল সম্প্রদায় নাকি বর্ত্তমান কংগ্রেসের অনুগত অনুচর এবং প্রায় অনেকেই নাকি চারি আনা পয়সা দিয়া সভ্যের খাতায় নাম লিখাইয়াছেন। নিজসমাজ বহির্ভূত ব্যক্তিকেও সম্মান এবং সেবা করিব, অথচ স্বজাতীয় নিম্নবর্ণের সংস্পর্শে "জাতি" যাইবে এরূপ ঘৃণিত ও আত্মবিনাশকর ব্যবহার-নীতি জগতের আর কোন সমাজে আছে কি? অথচ এইরূপ কার্য্যেরই আমরা দার্শনিক ব্যাখ্যা দিই এবং মনকে চোখ ঠারিয়া ভাবি আমাদের মত বুদ্ধিমান পৃথিবীতে আর কেহ নাই। মাদ্রাজ অঞ্চলে নিম্নজাতীয় হিন্দু আদি-দ্রাবিড়গণকে জব্দ করিবার জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলমানের সহিত একজোট হইয়া দাঙ্গা করিতেছেন, সংবাদ পত্রে কিছুদিন ধরিয়া এই খবর বাহির হইতেছে। কিন্তু কেহ কখন শুনিয়াছেন কি যে কোন মুসলমান সম্প্রদায় অপর কোন মুসলমান সম্প্রদায়কে জব্দ করিবার জন্য হিন্দুর সহিত মিলিয়া মারধর করিয়াছেন? "দেশের কাজের" জন্য সভা সমিতিতে যে সকল রেজোলিউসন বা মন্তব্য প্রকাশ

হইতেছে তাহার কয়টাতে আমাদেরই সমাজস্থ আমাদিগকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও অবমানিত নিম্নবর্ণ ভাইদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হইতেছে? কংগ্রেসের অন্যান্য রেজোলিউসন লইয়া যত আড়ম্বরের সহিত কাজের চেষ্টা হইতেছে অস্পৃশ্যতা মোচনের নিমিত্ত তাহার শতাংশের একাংশও হইতেছে কি? বর্ত্তমানে "দেশের কাজের" জন্য যে দেশময় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে যে সকল উচ্চবর্ণের হিন্দু বক্তা, প্রচারক ও লেখক আছেন, দেশশাসনের ষোল আনা ক্ষমতা পাইলে তাঁহারা যে তাঁহাদেরই পদদলিত ভাইদের প্রতি সেই সাম্যভাব দেখাইবেন যে সাম্যভাব তাঁহারা সাহেবদের নিকট পাইতে চাহেন, তাহার কোনই প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বহুযুগ সঞ্চিত এই মজ্জাগত আত্মম্ভরিতার ফলে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উচ্চশ্রেণীর প্রতি যে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার হইতেছে, উচ্চশ্রেণী যদি এখনও সাবধান না হন তবে পরিণামে ঐ ক্রোধ বহ্নিতে তাঁহাদিগকে সকল দর্প ও গর্ব্ব লইয়া ভস্ম হইতে হইবে। স্কুলের বালক হইতে কংগ্রেসের সভাপতি পর্য্যন্ত সকলেই স্বজাতিকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করেন; কিন্তু এক দাস আবার অপর দাসকে পদতলে রাখিতে চায় কেন? বিজাতির পদতলে পতিত দাসের এ আস্পর্দ্ধা কেন? আমরা যখন দাস হইয়াছি, তখন সব দাস এক হইয়া থাক্। খবরের কাগজ ও বক্তৃতাদ্বারা কোন কৃত্রিমভাবের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে "জাতীয় জাগরণ" ইত্যাদি নামে ভূষিত করিলেই জাতিগঠন হয় না; এবং অ-ভদ্রজাতির তুলনায় যাহাদের সংখ্যা শতকরা ৬ ছয়জন মাত্র এমন জনকয়েক লোকে মিলিয়া সভা করিলে সে সভাকে সমগ্রজাতির প্রতিনিধি বলা যায় না

এতো গেল হিন্দু সমাজের অন্তর্গত নিম্নজাতির প্রতি উচ্চজাতির ঘৃণা ও অবহেলা। ইহা ছাড়া ছুঁৎমার্গের দ্বারদিয়া সমাজের কত লোককে আমরা গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতেছি তাহাও বিবেচ্য। পুরুষানুক্রমে নির্য্যাতন ভোগ করিয়া নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছে ইহা ঐতিহাসিক সত্য; এখনও নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে অনেকে খৃষ্টান ও মুসলমান হইয়া স্বধর্ম্মীকর্ত্তৃক অপমান ও নিগ্রহের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা পায়। কিন্তু যদি কেহ ফিরিয়া আসিতে চায় আমরা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কি তাহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি? একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুসলমান পর্য্যটক আল্‌বেরুণী দেখিয়া গিয়াছেন যে সুলতান মামুদ প্রভৃতি মুসলমান আক্রমণকারীরা যে সকল হিন্দুকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া চিরদাসত্বে এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে যদি কোন হতভাগা অনেক বিপদ ও কষ্ট সহ্য করিয়া পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া আশাপূর্ণহৃদয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, হিন্দু ভাইরা তাহাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; এবং সে মায়ের দুয়ারে মাথা কুটিয়া চোখের জলে মাটি ভিজাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। নয়শত বৎসর পরে আজও আমরা সেই সনাতন নিয়মই পালন করিতেছি; শুধু তাহা নয়, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কোন নিয়মই যে পরিবর্ত্তন হয় না, এই বলিয়া বুক দুলাইয়া গর্ব্বও করিয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত বহিস্করণ নীতির ফলে হিন্দুজাতি কত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, হিন্দু সমাজ কি তাহা ভাবিয়া দেখেন?

নড়াইল।

শ্রীরমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

টিপ্পনী

মহাত্মা গান্ধি সে দিন বাঙলা দেশটা প্রদক্ষিণ করে গেলেন, কিন্তু শুনতে পাই যে তিনি বাঙালীর প্রতি যে মনোভাব নিয়ে ফিরেছেন—তাকে ঠিক দক্ষিন বলা যায় না।

তিনি নাকি আবিষ্কার করেছেন যে বাঙলা দেশের বেশির ভাগ লোক সহযোগীও নয়, অসহযোগীও নয়। তবে তারা কি? আমাদের দার্শনিকদের মধ্যে দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী ছাড়া যেমন আর একদল দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আছেন তেমনি আমাদের পলিটিক্সেও নাকি সহযোগী অসহযোগী ছাড়া আর একদল আছেন যাঁদের নাম হওয়া উচিত সহাসহযোগী। অর্থাৎ তাঁরা যাঁরা মুখে অসহযোগী, কাজে সহযোগী। উপরন্তু বাঙালীদের ভিতর জন কয়েক বিশিষ্টাসহযোগবাদীও আছেন। ফলে এখানে এক বাক্ বিতণ্ডা ছাড়া আর কিছু হবার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। এ কথা একেবারে মিছে নয়।

২

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর কি কথোপকথন হয়েছে তা জানবার জন্য যেমন কৌতূহল হয়েছে অসহযোগীদের তেমনি হয়েছে সহযোগীদের। অথচ এ কৌতূহলের কোনও মানে মোদ্দা নেই। এঁদের দুজনের ভিতর কথাবার্ত্তা গোপনে হয়েছে বলে যে গুপ্তমন্ত্রণা হয়েছে এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত। এ ত রেডিং-গান্ধী সংবাদ নয় যে তা গুহ্য হতে বাধ্য।

আমরা ধরে নিতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বসাধারণের কাছে যে মত প্রকাশ করছেন মহাত্মা গান্ধীর কাছেও সেই মতই প্রকাশ করছেন এবং মহাত্মা গান্ধীও তাই করেছেন। উভয়ের মতামত ত আমরা সবাই আজ জানি, সুতরাং আমরা মনে মনেই সে কথোপকথন রচনা করে নিতে পারি তার জন্য রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বচর কোনও চরের দ্বারস্থ হবার কারও প্রয়োজন নেই।

আমি আন্দাজ করছি এই কথোপকথনের ফলে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই রয়ে গেছেন আর মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বীণা ছেড়ে চরকা ধরবেন না আর মহাত্মা গান্ধীও চরকা ছেড়ে বীণা ধরবেন না। আমাদের পক্ষে এ অতি আনন্দের কথা, কেননা সভ্য সমাজের মানুষের পক্ষে জ্ঞানও চাই কর্ম্মও বাণীও চাই কানীও চাই অতএব বীণাও চাই চরকাও চাই। জ্ঞান মার্গ কর্ম্ম মার্গের বিপরীত নয়। এ দুই শুধু বিভিন্ন।

আমার এ অনুমান যে সত্য তার প্রমাণ, মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে তাঁর কাজের ও তাঁর নিজের রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কোনও বিপদ নেই। অপর পক্ষে তাঁর চেলাদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথেরও তাঁর কথার যে কোন বিপদ না হোক আপদ নেই একথা বলা চলে না।

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি কলকাতায় যে কটি বক্তৃতা দিয়েছেন তার মধ্যে সেরা দুটি হচ্চে "শিক্ষার মিলন" ও "সত্যের আহ্বান"। এ দুটি বক্তৃতায় তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা শুনে নাম-লেখানো অসহযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ যে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তার প্রমাণ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁরা "শিক্ষার মিলনের" প্রতিবাদ করতে প্রবৃত্ত করেছেন। "শিক্ষার মিলন"

নাকি কবির কবিত্ব অতএব তার খণ্ডনের জন্য অবশ্য চাই ঔপন্যাসিকের উপন্যাস। এ রকম ব্যবস্থা এক বাঙলা ছাড়া আর কোথায়ও আর কারোও মনে আসত না। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে "শিক্ষার মিলনের" উপর আক্রমণ করবেন এমন ত মনে হয় না। তাঁর প্রবন্ধের নাম থেকেই বোঝা যায় যে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতের উতোর গাইবেন না। "শিক্ষার মিলনের" পাল্টা জবাব "শিক্ষার বিরোধ" নয়, তা হচ্ছে "অশিক্ষার মিলন"। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন "শিক্ষার বিরোধের" বিষয় বলবেন তখন তিনি সে বিরোধের যা হয় একটা সমন্বয় করবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন। শিক্ষার আসল বিরোধটা হচ্ছে অশিক্ষার সঙ্গে,—অপর শিক্ষার সঙ্গে নয়। কেননা শিক্ষার অর্থই হচ্ছে পরের কাছে শিক্ষা।

আলি ভ্রাতাদ্বয়কে গ্রেপ্তার করায় সরকার বাহাদুর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন কিনা এ নিয়ে দেখ্‌তে পাই অনেকে মাথা বকাচ্ছেন। এসব নিয়ে আলোচনা করাটা আমার মতে আমাদের পক্ষে, চিন্তাশক্তির একান্ত বাজে খরচ করা। সরকারের ভাবনা ভাববার দায় সরকার আমাদের মাথায় চাপিয়ে দেননি। সরকার যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন। এর ফল সরকারের পক্ষে ভালই হোক আর মন্দই হোক সে ফল সরকারই ভোগ করবেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা সরকারের চরকায় তেল দিতে সদাই ব্যস্ত আশাকরি এ গ্রেপ্তারের ভিতর তাঁদের হাত নেই।

সরকারের এ পলিসি ভাল কি মন্দ সে হচ্ছে পরের কথা, সরকারের পলিসিটি যে কি আগে তাই বোঝবার চেষ্টা করা যাক্। এ কি অসহযোগীতা দমনের সূচনা? জেলে পুরলে অসহযোগীরা

যে সহযোগী হয়ে উঠবে এ সম্ভাবনা খুব কম। কারাগারের বন্দীদের যে ক্রিয়া অভ্যাস কর্‌তে হয় সে হচ্ছে হঠ-যোগ, রাজ-যোগ নয়। অপরপক্ষে এই ধর পাকড়ের ফলে অনেক সহযোগীও অসহযোগী হয়ে উঠতে পারে। রাজনীতির ক্ষেত্রে একের জেল-যোগ প্রায়শই বহুর পক্ষে অসহ।

তবে কি এই সব গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্য খিলাফৎ দমন? খুব সম্ভব তাই। স্বদেশী যুগে মুসলমান সম্প্রদায় ছিল ইংরাজ রাজের সুয়োরাণী আর এই স্বরাজী যুগে হয়েছে "দুয়োরাণী"।

এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কবিই ত বলেছেন—

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ"

এখন দেখা যাক এই দমন-নীতির দৌড় কত দূর। সরকারের পক্ষে আলিভ্রাতাদ্বয়কে ধরা ত সাপে ছুঁচো ধরা হয় নি?

রাজ্যশাসন প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপারের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার বৃথা চেষ্টা না করে এখন একটা ঘরের কথা বলা যাক্। শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলির গ্রেপ্তারে আমি নিতান্তই দুঃখিত হয়েছি কেন না তিনি আমার বহুদিনের বন্ধু। এবং সে বন্ধুত্ব বরাবর বজায় আছে যদিচ পলিটিক্সে আমি তাঁর সঙ্গে কখনও একমত হতে পারিনি। স্বদেশী যুগে তিনি আমার সহযোগী হতে পারেন নি। আর এই স্বরাজী যুগে আমি তাঁর সহযোগী হতে পারি নি। আমাদের পরস্পরের পলিটিকাল মতের অমিলের মূলে আছে আমাদের মনের পলিটিকাল প্রস্থান ভূমির প্রভেদ। সে প্রভেদ হচ্চে Indian Nationalism এর সঙ্গে Pan-islamism—এর যে প্রভেদ।

এ প্রভেদ সত্বেও শ্রীযুত মহম্মদ আলির সঙ্গে আমার সখ্য অদ্যাবধি যে অটুট রয়েছে তার কারণ, রাজনীতির বাইরে একটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেখানে আমরা দুজনে Comrade। আমরা দুজনে হচ্ছি এক কলমের ইয়ার। Comrade এর লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলির কলমের স্পর্শে ইংরাজি ভাষা কেমন হেসে খেলে নেচে কুঁদে বেড়ায়। আমার দুঃখ আমি উর্দ্দু জানিনে যদি জানতুম তাহলে তার উর্দ্দু লেখা যে আমার অতি প্রিয় হত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

সে যাই হোক; বহুকাল পরে সেদিন শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমার সঙ্গে তাঁর মিলনের আলিঙ্গন যে আসলে বিদায়ের আলিঙ্গন এ কথা সেদিন জানতুম না। আজ তাই কলমের মুখ দিয়ে তাঁকে Au revoir বলতে বাধ্য হচ্চি। আশা করি তাঁর পুনর্দ্দর্শন অচিরে পাব।

বীরবল।

সেপ্টেম্বর ১৯২১

ভারতের শিক্ষার আদর্শ।*

—:০:—

১ম পরিচ্ছেদ।

ভারতের শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কথারই আলোচনা করবার সংকল্প করছি।

বিশ্বের দেয়ালী যজ্ঞে যোগ দিবার জন্য প্রত্যেক জাত্‌কেই তার চিত্ত-প্রদীপটীকে জ্বালিয়ে রাখ্‌তে হয়। কোনও জাতি এই দীপটীকে নষ্ট কর্‌লেই বিশ্বের উৎসবে যোগ দেবার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হয়। যার এই আলোকের সঞ্চয় নাই সে ভাগ্যহীন বটে; কিন্তু তার চেয়েও অধিক ভাগ্যহীন সে যে এ থাকা সত্বেও এর ব্যবহার থেকে ভ্রষ্ট কিম্বা এর সম্বন্ধে উদাসীন।

ভারতের যে একটী বিশেষ স্বকীয় চিত্ত আছে সে যে এই চিত্তের দ্বারা গভীর ভাবে চিন্তা করেছে এবং নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেছে সে যে এরই আলোকে জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করেছে আমরা তার প্রচুর প্রমাণ পেয়েছি। ভারতের এই চিত্তকে সত্য আবিষ্কার কর্‌বার্ এবং সেই সত্যকে আত্মসাৎ করে জীবনের মধ্যে প্রকাশ কর্‌বার যোগ্য করে তোলাই ভারতের শিক্ষার উদ্দেশ্য।

*রবীন্দ্র নাথের The Centre of Indian Culture নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

এই উদ্দেশ্যটীকে সার্থক করতে হলে প্রথমেই ভারতের সমস্ত চিত্তকে একই কেন্দ্রে সংহত এবং তার আত্মবোধকে পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত করে তুলতে হবে। একমাত্র এই উপায়েই সে তার গুরুর নিকট হতে যথার্থভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবার অধিকারী হবে এবং এরই দ্বারায় সেই লব্ধ শিক্ষাকে সে নিজের আদর্শে বিচার করবার এবং তার নিজের সৃজন শক্তির সহযোগে তাকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে পরিস্ফুট করে তুলবার ক্ষমতা লাভ করতে পারবে। গ্রহণ করবার সময় যেমন হাতের আঙ্গুলগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করতে হয় দান করবার বেলাতেও তাই। অতএব আমরা যখন ভারতের এই সব বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একই চেষ্টার মধ্যে মিলিত করতে পারব তখন তারা যেমন একদিকে গ্রহণক্ষম হবে তেমনি আর একদিকে তাদের সৃষ্টি-শক্তিরও উন্মেষ হবে। তখন আর বিক্ষেপের ফাঁক দিয়ে জীবনের রসধারা স্খলিত হয়ে যাত্রাপথকে পিচ্ছিল করবে না।

তারপর শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দান করতে হলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে সৃষ্টির উদ্যমকে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট রাখতে হয়। এই কারণেই জ্ঞানের সৃজন-ক্ষমতার অনুশীলনের দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। এর তরে মানুষকে একত্র সমবেত করতে হবে এবং তাদের মানসিক অনুসন্ধান ও সৃষ্টির কাজে তাদের অবাধ এবং সম্পূর্ণ অবকাশ দিতে হবে। উৎসের উদ্বেল জলধারার মত আমাদের শিক্ষা তখন এই অনুশীলনের মধ্যে থেকে স্বতঃই উৎসারিত হতে থাকবে। শিক্ষা যখন এমনি সজীব এবং বর্দ্ধমান জ্ঞান থেকে উদ্ভূত হয় তখনই তা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠে।

আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবন যাত্রার সম্পূর্ণ যোগ থাকা চাই। সে শিক্ষাকে আমাদের আর্থিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি সকল বিষয়েই স্থান দিতে হবে। আমাদের শিক্ষালয়কে সমাজের মধ্যেই স্থাপিত করতে হবে। বিচিত্র সজীব সহযোগিতার বন্ধনে একে আমাদের সমাজের সহিত যুক্ত করে রাখতে হবে। আমাদের চতুর্দ্দিকের সঙ্গে আমাদের শিক্ষার যে একটা যান্ত্রিক সম্বন্ধ আছে প্রতিপদে তাকে উপলব্ধি করাই প্রকৃত শিক্ষা।

২য় পরিচ্ছেদ।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট অসন্তোষ ভারতের সকল স্থলেই পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের মনে যে একটা পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে তার চিহ্ন যেখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে। আমাদের জাতীয় চিত্তের অন্তস্তরে যেন একটা প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। নূতন ব্যবস্থা এবং নূতন পরীক্ষা করবার জন্য আমাদের মধ্যে যেন একট তাগিদ এসেছে। কিন্তু প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যখন আমাদের কোনও ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠে তখন তা' আমাদের একান্ত অব্যবহিত হওয়ায় আমরা সকল সময় তার কারণ ঠিক করতে পারি না এবং তার লক্ষ্য যে কি তাও ঠিক করা আমাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠে।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্ত এই বর্ত্তমান শিক্ষার ব্যবস্থার বেষ্টনের মধ্যেই তৈরি হয়ে উঠেছে। এ আমাদের এই শরীরের মতই একান্ত আপনার হয়ে পড়েছে এর যে কোনও রকম পরিবর্ত্তন হতে পারে একথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। এর সীমার বাহিরে যেতে আমাদের কল্পনার সাহস হয় না। একে বাহির থেকে দেখে এর সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের একেবারে সাধ্যাতীত। আর কিছুকে যে এর আসনে স্থান দিতে পারা যায় একথা বলতে আমাদের মনও উঠে না এবং ভরসাও হয় না। তার কারণ আমাদের মন এই ব্যবস্থারই বিশেষ সৃষ্টি বলে এর প্রতি স্বভাবতঃ আমাদের একটা মমতার পক্ষপাতিতা এবং আসক্তি আছে।

তা হলেও এই আত্মপ্রসাদের গভীরতার মধ্যে কোথায় যেন একটা পীড়ার হেতু আছে—তাই থেকে আমাদের যে শাস্তির ব্যাঘাৎ হচ্ছে একথা আমরা যেন বেশ অনুভব করছি। কিছু দিন এই গুপ্ত পীড়া ভোগ করবার পর আমরা শেষে রাগের মাথায় বাইরের ঘটনা বিশেষকে তার হেতু বলে নির্দ্দেশ করতে আরম্ভ করেছি। আমরা বলে থাকি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান গলদ এই যে ইহা আমাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন নয়—অর্থাৎ এই জাহাজটী সমুদ্র যাত্রার পক্ষে অপর সকল বিষয়েই উপযোগী এর হালটী কেবল আমাদের হাতে দিলেই আমরা পাড়ি জমাতে পারব। সম্প্রতি আমরা যে সকল জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করছি এই বাহিরের স্বাতন্ত্র্য লাভ করাই যেন সেই সব উদ্যোগের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা একথা বিস্মৃত হই যে চরিত্রের যে দুর্ব্বলতা এবং অবস্থার যে হীনতা আমাদের অনুকরণের পথে নিয়ে যায় শুধু বাহিরের স্বাধীনতা

লাভ করলেই আমরা তাদের হাত এড়াতে পারব না—তারা তখনও সেই একই ভাবে আমাদের অনুসরণ করতে থাকবে। আমরা এই বাহিরের স্বাতন্ত্র্য থেকে অনুকরণ করবার স্বাধীনতা পাব মাত্র তখন অনুকরণ করবার পথে আমাদের আর কোন বাধাই থাকবে না। অনুকরণ এবং অনুকরণের নিকৃষ্টতা এই দুই মন্দগ্রহের প্রভাবে আমাদের মন্দভাগ্য আরও মন্দ হবে। এখন আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় কলের সামগ্রী বটে, কিন্তু তখন আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করব তা' হবে খারাপ কলের খারাপ সামগ্রী।

কোনও ক্রীড়ায় যখন এক পক্ষের পরাজয় হয় তখন যেমন পরাজিত পক্ষের অন্তর্গত খেলোয়াড়রা তাদের বিফলতার জন্য পরস্পরকে দোষী করতে থাকে তেমনি আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটী নিয়ে আমাদের ও বিদেশী কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দোষারোপ করা-করি চলেছে। এর জন্যে যে আমরা উভয় পক্ষেই দোষী একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। তাহলেও আমরা যখন স্বয়ং এই দোষে গভীর ভাবে লিপ্ত তখন এই ব্যর্থতার তরে কে কতটুকু দায়ী তা' নিয়ে আলোচনা করলে তাতে শুধু মিছে তক্‌রার ব্যতীত অপর কোনও লাভ হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আমরা স্বয়ং এর জন্যে কতটুকু দায়ী তা' স্থির করাই এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

অনেকে শূদ্রের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বলে থাকেন ব্রাহ্মণেরাই শূদ্রদের দুর্গতির জন্য দায়ী। এই অপবাদ সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক—একথা স্বীকার করতেই হবে যে শূদ্ররা যে একান্ত কাপুরু-

ষর মত তাদের উপর অত্যাচার কর্‌বার জন্যে ব্রাহ্মণদের অবসর দিয়েছিল এর জন্য বস্তুতঃ দায়ী শূদ্ররা। ব্রাহ্মণদের একমাত্র অপরাধী না করে শূদ্রদের নিজেদের এই দায়িত্বের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলে আমার বোধ হয় তাদের সত্যকার উপকার করা হবে।

অতএব আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য অপর পক্ষ কি পরিমাণে দায়ী সে কথা বিস্মৃত হওয়াই এখন আমাদের উচিত। আমাদের পা নাই এই কল্পনা করে আমরা যে এতদিন বিদেশে প্রস্তুত কাঠের পা'ওয়ালা কৃত্রিম শিক্ষার মুখ চেয়েছিলেম আমাদের এই পরাসক্তির দুর্ব্বলতাকেই অপরাধী কর্‌তে হবে। গল্পে শুনেছি এক ব্যক্তি ডুব-জলে গেছে এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই একান্ত অগভীর জলের মধ্যেও প্রাণ হারিয়েছিল। আমাদের শিক্ষার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ দাঁড়িয়েছে।

মুস্কিল এই যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমাদের মনে হয় তখন হয় কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি না হয় অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি কিম্বা কোনও না কোনও একটা ইউরোপীয় ইউনিভার্‌সিটীর চিত্র আমাদের মনের সম্মুখে জেগে উঠে সমস্ত মনটাকে পেয়ে বসে। তখন আমরা ভাবি তাদের প্রত্যেকের উত্তম অংশ গুলিকে নির্ব্বাচন করে নিয়ে তাদের জোড়তাড় দিয়ে একটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অবয়ব গড়্‌লেই আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে। একথা আমরা ভুলে যাই যে ইউরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি ইউরোপের জীবনেরই সজীব ও অঙ্গীভূত অংশ—সে-বিশ্ব-বিদ্যালয় সেখানে স্বভাব থেকেই উদ্ভূত হয়ে উঠেছে। অপর দেহ থেকে মাংস কিম্বা অস্থি নিয়ে নাসিকা ইত্যাদি দেহের খণ্ডাংশের সংস্কার করার বিধান বর্ত্তমান অস্ত্র-চিকিৎসা শাস্ত্রে আছে

বটে; কিন্তু বাহির থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঙ্কলন করে তাকে গ্রথিত করে একটা আস্ত মানুষ গড়ে তোলার বিদ্যা এখনও বিজ্ঞানের আয়ত্ত্বাধীন হয় নাই এবং আশা করি ভবীষ্যতে কখনও হবে না।

ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পূর্ণ মূর্ত্তিতেই আমাদের কল্পনায় উদিত হয়। এরই তরে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মূর্ত্তি ছাড়া অপর কিছুর ধারণা কর্‌তে পারি না। আমাদের প্রতিবেশীকে তার পূর্ণবয়স্ক সন্তানের নিকট হতে সাহায্য এবং শুশ্রূষা লাভ কর্‌তে দেখে আমাদের মনে সন্তানের কামনা স্বভারতঃই জেগে উঠে; কিন্তু যদি এই মুহুর্ত্তেই আমরা পূর্ণবয়স্ক সন্তানের কামনা করি তাহলে সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে হয়তঃ একটা পোষ্যপুত্র পেতে পারি কিন্তু এমন ভাবে হঠাৎ আসল পুত্র পাওয়া অসম্ভব। ফল লাভের অত্যাকাঙ্ক্ষা থেকে অনুকরণের যে জঘন্য প্রবৃত্তি জন্মায় তা' দুর্ব্বলতা মাত্র। সেই দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হওয়াতেই আমাদের মনে একেবারে প্রথম থেকেই পূর্ণ পরিণত বিশ্ববিদ্যালয় লাভ কর্‌বার আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়। এর ফলে আমাদের অধিকাংশ চেষ্টাই বিফল হয় কিম্বা যদি তা' ক্বচিৎ কখনও সফল হয় তাতে করে আমরা মূর্ত্তিকানির্ম্মিত নকল ফল পাই। সেই ফল অবয়বে এবং আয়তনে আসল ফলের অনুরূপ হলেও তাকে যখন গলাধঃকরণ করি তখন আমাদের অকল্যাণই হয়ে থাকে। এই যে পূর্ণ পরিণত বিশ্ববিদ্যালয় লাভের সংকল্প আমাদের দেশের চিন্তাকে অধিকার করে আছে এ' সিদ্ধকরা ডিমেরই অনুরূপ—এ থেকে কখনও শাবক উদ্ভূত হবে এ প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। [illegible] মরা নই—আমাদের ইউয়োপীয় গুরুমহাশয়রাও এ কথা বিস্মৃত হন যে তাঁদের দেশের

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে ক্রমে গঠিত হয়ে উঠেছে। আরম্ভে তাদের কোনও বাহ্য উপকরণের ঐশ্বর্য্য ছিল না এবং এই বাহ্য উপকরণের সহিত তাদের আসল সত্যেরও কোনও সম্পর্ক নাই। প্রথম অবস্থায় দরিদ্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই যে তার শিক্ষার পৈতাদান করেছিল এবং তার বিদ্যার্থীদের মধ্যে অধিকাংশ যে তখন দরিদ্র ছিল আজ ইউরোপ তার এই উন্নতির দিনে সে কথা বিস্মৃত হতে পারে; কিন্তু আমাদের এই দরিদ্র দেশে বাহ্য উপকরণের দ্বারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারাক্রান্ত করার যে কোনও প্রয়োজন নাই এ কথা সে যদি বিস্মৃত হয় তাহলে তার ফল আমাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হবে। আমাদের দেশে এখন যে সব বিদ্যালয় আছে আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে তা' যথেষ্ট নহে; সুতরাং একথা মান্‌তেই হবে যে উপকরণ এবং আসবাব বৃদ্ধি করে তাদের প্রসারের পথে বাধার সঞ্চার করা কোনও মতেই বিধেয় হতে পারে না।

খাদ্যকে রাখ্‌বার জন্য পাত্রের যে একটা প্রয়োজন আছে এ কথা আমি বেশ বুঝি; কিন্তু যেখানে খাদ্যেরই অভাব সেখানে পাত্রের সম্বন্ধে কৃপণতা করা অশোভন হয় না। শিক্ষার আসবাবকে বাড়িয়ে তাকে দুষ্প্রাপ্য করে তোলা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে লোহার সিন্দুক খরিদ করারই অনুরূপ।

এই প্রাচ্য ভূখণ্ডে আমাদের নিজের ভাবেই আমাদের জীবন সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে হবে। আমরা আমাদের অন্নবস্ত্রের অভাবকে যথাসম্ভব খর্ব্ব করে রেখেছি। আমাদের এখানের জলবায়ু আমাদের একাজে যথেষ্ট সহায়তা করে। আমাদের এখানে প্রাচীরের আবরণের চেয়ে খোলা জায়গার বেশী দরকার। আমাদের

পোষাকে বাতাস আলোর পথ যত থাকে ততই ভাল। বস্ত্রস্তূপে আমাদের শরীরের তত দরকার হয় না। দেহের উত্তাপ রক্ষার তরে অপর দেশে উত্তেজক খাদ্য ও পানীয় ব্যবহার কর্‌তে হয়; কিন্তু আমাদের দেশে সূর্য্যের উত্তাপই দেহের উত্তাপ উৎপাদন ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। এই সব প্রাকৃতিক সুবিধার ফলে আমাদের জীবন—যাত্রায় যে উপকরণ-বিরলতার বিশেষত্ব সম্ভব হয়েছে আমাদের শিক্ষা বিষয়ে সেই বিশেষত্বকে উপেক্ষা করায় আমাদের কখনই কল্যাণ হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

দারিদ্র্যকে মহিমান্বিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু পল্লবিত বিলাসিতার চেয়ে নগ্ন সরলতা যে অধিক উপাদেয় একথা স্বীকার কর্‌তেই হবে। শুধু প্রাচুর্য্যের অভাবই যে এই সরলতা তা' নয়—ইহাই পূর্ণতার লক্ষণ। আমরা যখন এই সরলতাকে লাভ কর্‌তে পার্‌ব তখনই আমাদের গতিপথ থেকে সব অন্তরায় দূর হয়ে যাবে। এই সরলতার অভাব থেকেই আমাদের জীবন-যাত্রার উপকরণ সকল এমন দুর্ম্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।

সভ্য জগতের অনেক অভাবই বাহুল্য মাত্র। আমরা এমন অনেক ভার বহন করি যা' একান্তই অনর্থক। এতে আমাদের বলের পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এ কার্য্যদক্ষতার লক্ষণ নয়।

পশ্চিম যে দিন পূর্ণতার মধ্য দিয়ে এই সরলতাকে লাভ কর্‌বে সেই দিন সে তার কর্ম্ম এবং শিক্ষা কে সহজ করার মধ্যেই নিজের শক্তির গৌরব অনুভব কর্‌বে। সে দিন কবে আস্‌বে জানি না; কিন্তু সে দিন না আসা পর্য্যন্ত আমাদের একথা পুনঃ পুনঃ শুন্‌তেই হবে যে উচ্চ শিক্ষা একমাত্র উচ্চতম অট্টালিকা হতেই পাওয়া যায়।

এই বাহ্য অবয়ব ও আসবাব যে পরিমাণে আত্মার বিকাশের অনুকূল হয় সেই পরিমাণে তাদের স্বীকার করতেই হবে। সেখানে তাদের অস্বীকার করলে আত্মাকেই খর্ব্ব করা হয়—এ কথা আমি জানি। তবে সেই পরিমাণটী যে কি, ইউরোপ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও তা' স্থির করতে পারে নি। আমরা যদি নিজে তাকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করি তাহলে তাতে বাধা দেওয়া কেন? দরিদ্র না হয়ে কি করে সরল হওয়া যায় এই সমস্যাকে আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী মীমাংসা করতে হবে। আমরা বাহির থেকে শিক্ষার বিষয়কে গ্রহণ করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি; কিন্তু সেই সঙ্গে যদি বাহিরের প্রকৃতিকে আমাদের মধ্যে বল-পূর্ব্বক প্রবেশ করাবার চেষ্টা করা হয় তা' একান্তই অন্যায় হবে এবং আমরা তা কখনই সইব না। আমাদের গুরুমহাশয়দের এইরূপ অন্যায় চেষ্টার দ্বারাই আমাদের চিত্ত বিকৃত হয়ে গেছে। আমরা আয়তনের অনুসরণ করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছি এবং হারাচ্ছি।

———

৩য় পরিচ্ছেদ।

——:০:——

বাঙলায় যখন জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছিল সে সময় তার একজন প্রধান উদ্যোগীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। একদিনের মধ্যে একটা ফুলে ফলে পূর্ণ পরিণত বিশ্ববিদ্যালয় রচনা করা সম্ভব বলে তিনি প্রকৃত বিশ্বাস করেন কি না একথা

তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে এই উত্তর দিয়েছিলেন যে যদি উহা সম্ভব না হয় তা' হলে ওর দ্বারা দেশের মন আকর্ষণ করাও সম্ভব হবে না; অতএব অগত্যা সম্পূর্ণ জিনিসটীকে দেশের সম্মুখে গোড়া থেকেই ধরা চাই। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটীকে দেশের সম্মুখে উপস্থিত করা হল—দেশও মুগ্ধ হল—অজস্র অর্থও সংগৃহীত হল—আর সমস্ত অভাবই প্রায় পূরণ হল; কেবল সেই সত্য—যা আরম্ভের ক্ষুদ্র আয়োজনকে কখনও অবজ্ঞা করে না—যে তার ক্ষীণ পর্ণপুটের মধ্যে সুমহৎ ভবিষ্যতকে বহন করতে লজ্জিত হয় না—ওই অনুষ্ঠানের মধ্যে কেবলি তারই স্থান হল না! এই নকল শিক্ষা-পরিষদরূপ গাছটী নিজেকে ফলাও কারবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টায় সঞ্চিত শক্তির ক্রমশঃ অপচয় করে করে এখন এমনি দুরবস্থার মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে যে নিজের কাছেও ঠাট বজায় রাখতে পারে এমন সম্বলও তার নাই। এই থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে যে কেবল মাত্র নিজেদের একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করে তাকে নিজেদের তত্ত্বাবধানের অধীনে রাখলেই আমরা তাকে আমাদের করতে পারব না।

আমাদের মন যে অসন্তোষে পীড়িত হচ্ছে তার মূল কারণটী কি তা ঠিক করাই এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। আজ এক শতাব্দী অতীত হল আমরা ইংরাজি পাঠশালে প্রবেশ করেছি। সে অনেক দিনের কথা বটে; কিন্তু এখনও আমরা সেখান থেকে বের হতে পারি নি—এখনও আমরা সেই পাঠশালার পড়ুয়াই রয়ে গেছি। ইঁদুর কলের মধ্যে ইঁদুর আশ্রয় পায় বটে কিন্তু সেই কল তাকে বদ্ধ করারই যন্ত্র। আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলিও আমাদের পক্ষে

ঠিক তেমনি হয়েছে। ভয় হয় পাছে এই অবস্থাটা চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

কেউ জীবনের একটা নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারে না; কারণ জীবন প্রতি মুহূর্ত্তই তার উপাদান সমূহকে অতিক্রম করে চলেছে,—একে বিশ্লেষণ করে আমরা যা' পাই এ অখণ্ডরূপে তার চেয়ে ঢের বড়। এ যে সব উপাদান গ্রহণ করে তাদের সমষ্টির চেয়ে এ ঢের বেশী। আমাদের মনও এইরূপ। সে যে সব তথ্য এবং শিক্ষা বাহির থেকে গ্রহণ করে তার চেয়ে তার দান খুব বেশী। যে শিক্ষা মনকে সজীব বলে স্বীকার করে এবং মন বাহির হতে যা গ্রহণ করে তার চেয়ে বেশী দান করবার প্রবৃত্তিকে যে শিক্ষা মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। এই আদর্শেই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিচার করতে হবে।

অতএব এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বাহির থেকে আমরা যা' পেয়েছি আমরা কি বিশ্বকে তার চেয়ে বেশী কিছু দিয়েছি কিম্বা আমরা কি নিজের মধ্য থেকে নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছি! যখন কোনও জাত বিশ্বের গলগ্রহ হয়ে পড়ে—যখন বিশ্বের সহিত তার দেনা পাওনার হিসাব করলে দেখা যায় তাকে বহন করতে বিশ্বকে যে খরচের দায়ী হতে হয় তার মূল্য তার দানের চেয়ে বেশী হয়ে পড়েছে তখন তার সেই অবস্থায় বেঁচে থাকার অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। কেননা এইরূপে কেবলি পরের সামগ্রী অপহরণ করে বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয় অবস্থা।

আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যা' গ্রহণ করি তাকে তার চেয়ে বেশী দেওয়া দূরের কথা আমরা ততটুকুও তাকে ফেরত

দিই না। আমরা বড় বড় কথা কই—আমরা অনেক সত্য তত্ত্ব শিক্ষা করি—অনেক সুমহৎ দৃষ্টান্তেরও পরিচয় পাই; কিন্তু তার ফলে আমরা হয় কেরাণী না হয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা বড় জোর উকীল না হয় ডাক্তার হই।

ডাক্তার হওয়া যে সামান্য ব্যাপার একথা বলছি না; কিন্তু যদিও আমাদের ডাক্তারেরা আজকাল দেশের সর্ব্বত্রই চিকিৎসা করছেন—যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনও করেছেন তাহলেও তাঁদের এই বহু বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থেকে কোনও নূতন তত্ত্ব কিম্বা কোনও নূতন ঘটনা উদ্ভূত হয় নাই, তাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাণ্ডারের মধ্যে এতটুকু মাত্রও নিজেদের নূতন সৃষ্টি দান করতে পারেন নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রের মত তাঁরা যা' শিখেছেন তাহাই অতি সতর্কভাবে প্রয়োগ করে আসছেন। ছাত্রই কালক্রমে শিক্ষকে পরিণত হয়। যখন এর ব্যতিক্রম হয় যখন ছাত্ররা ছাত্রই থেকে যায় এবং শিক্ষকের যোগ্যতা লাভ করতে পারে না তখন দেশের যে দারুণ ক্ষতি হয় তা' পূরণ করবে এমন সাধ্য কারও এবং কিছুরই নাই।

অবশ্য আমাদের স্বাভাবিক শক্তির অভাব থেকে যে এরূপ হচ্ছে এ কথা আমি স্বীকার করি না। আমাদের ইতিহাস থেকে দেখতে পাই আমাদের অতীতের মধ্যে এমন একটা সুদীর্ঘ যুগ এসেছিল যখন আমাদের দেশের আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের মধ্যে একটা সজীবতা ছিল, যখন ইহা সজীব বৃক্ষের মতই দেশের সর্ব্বত্রই শাখা প্রশাখায় প্রসারিত হয়েছিল। এই থেকে অন্ততঃ আমরা এইটুকু শিক্ষা লাভ করি যে সেই বিগতযুগে আমাদের চিত্ত যা' লাভ

কর্‌ত তার সঙ্গে তার একটা সজীব বন্ধনের সূত্র ছিল—তখন আমরা কেবলি মুখস্থ কর্‌তাম না তখন আমরা পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তাম পরীক্ষা কর্‌তাম এবং নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করে তাকে জীবনের কাজে প্রয়োগ কর্‌বার প্রয়াস পেতাম।

আমাদের চিত্তের এই উদ্যম ও সৃষ্টি-শক্তি আজ কোথায় অন্তর্হিত হল? কেনই বা আজ আমরা শিক্ষার ভারে অভিভূত হ'য়ে ভয়ে ভয়ে এমন জড় সড় হয়ে ফিরছি? তবে এই কি আমাদের ললাটের লিখন যে চিরকাল আমরা কেবলি পরের শিক্ষার ভারবাহী কৃতদাস হয়ে থাক্‌ব? আমি বলি—"তা হতেই পারে না; কেননা আমাদের সুযোগের এই বিরলতা এবং ক্ষেত্রের এইরূপ সঙ্কীর্ণতা সত্ত্বেও এই প্রাণহীন শিক্ষার মধ্য থেকেই যখন জগদীশ চন্দ্র বসুর এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ন্যায় বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তার শীলের ন্যায় চিন্তাশীল পণ্ডিতের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে তখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের স্বভাবের মধ্যে সৃষ্টি শক্তির অভাব নাই সেই শক্তি কেবল যন্ত্র তন্ত্রের অতি-ভারে এবং নির্ম্মম অবজ্ঞা এবং অসুবিধার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মাত্র।"

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্য রতন প্রামানিক।

নারীর পত্র

—:*:—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়"

কবির এ প্রশ্নের সোজা উত্তর, আমরা চাই কেননা আমরা স্ত্রীলোক। স্বাধীনতা হীনতায় আমরা যে বাঁচতে চাই তার কারণ আমাদের বিশ্বাস ঐ অবস্থাতেই আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচেবর্ত্তে থাক্‌তে পারি।

এরূপ ইচ্ছা যে আমাদের হয় আর এরূপ বিশ্বাস যে আমাদের আছে তার অবশ্য কারণও আছে।

পরাধীনতায় আমরা যুগ যুগ ধরে এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে সেই অভ্যাসের গুণেই স্বাধীনতা আমাদের আরামের ব্যাঘাত করবে। আর বে-আরামে কার লোভ হয়?

তার পর আমাদের গুরুজনেরা আর গুরুরা, ভর্ত্তারা এবং কর্ত্তারা যুগ যুগ ধরে আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে অধীন থাকাতেই, পুরুষের সেবা করাতেই, নারীর নারীত্ব। পুরুষের আমরা যত বেশী অধীন হব, যত বেশি আজ্ঞাবহ হব, আমাদের জীবন পুরুষে যত বেশি লীন হয়ে যাবে, আমাদের আত্মা তত বেশি উর্দ্ধগামী হবে এবং শেষটা একদম স্বর্গে গিয়ে উঠবে। এক কথায় আমরা যত বেশি দাসী হব তত বেশি দেবী হব। এ সকল ধর্ম্ম উপদেশ আমাদের

মনে এতটা শিকড় গেড়েছে যে আমাদের আশঙ্কা যে স্বাধীনতা লাভ করলেই আমরা আমাদের দেবীত্ব হারাব। এই ভয়েই আমরা স্বাধীনতা-হীনতায় বাঁচতে চাই স্বাধীনতা নিয়ে মরতে চাই নে।

ইংরাজ-রাজ যখন আমাদের পুরুষদের স্বাধীনতা লাভের ছট-ফটানি দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন তখন আমার মনে হয় যে ইংরাজ বেচারাদের মাথায় মগজ নেই আছে শুধু কাগজ। ইংরাজ যদি আমাদের পুরুষদের দিবারাত্র বলত যে তোমাদের মত আধ্যাত্মিক জাত পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। অপর পক্ষে আমাদের ইংরাজদের মত ঐহিক-ভোগ-ঐশ্বর্য্য-লুব্ধ-দেহাত্মজ্ঞানী জাত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই, এক কথায় দাস মাত্রেই দেবতা তাহলে এদেশের পুরুষরা পাছে তাদের দেবত্ব নষ্ট হয় সেই ভয়ে তাদের দাসত্ব কিছুতেই ছাড়তে চাইত না। কিন্তু গোরা লোকে বলে যে তারা কালা আদমির চাইতে শ্রেষ্ঠ জীব কাজেই দেশের লোকের মেজাজ বিগড়ে যায় এবং তখন তারা মরিয়া হয়ে গান ধরে দেয়ঃ—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়"

এইত গেল স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে আমাদের অপ্রবৃত্তির কারণ।

তারপর পুরুষরা যখন স্ত্রী-স্বাধীনতার ধুয়ো ধরেন, তখন যে আমরা তার দোহার দিতে কুণ্ঠিত হই, তার কারণ পুরুষদের ও কথায় আমরা বিশ্বাস করি নে। তাঁরাও বিশ্বাস করেন কি না বলা কঠিন, কেননা ও কথার বিলেতে জন্ম। সে যাই হোক আমাদের সন্দেহ হয় যে আপনাদের মুখে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথাটা মিছে। মুখের কথায় আমাদের ভোগা দিয়ে আপনারা আমাদের দ্বারা আপনাদের কোনও

মতলব হাসিল করিয়ে নিতে চান। আপনাদের কথায় যদি আমরা বিশ্বাস না করি তাতে আমাদের দোষ নেই, কেননা আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেই বলে যে স্ত্রীলোকের কাছে মিথ্যে কথা বলায় পুরুষের কোনও দোষ নেই। তা ছাড়া আমাদের কাছে পুরুষেরা কত সত্য কথা বলেন সে বিষয়ে আমাদের নিজেদেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। যাক্ ও সব সাধারণ কথা। এখন একটী কাজের কথায় আসা যাক।

কি কাউন্সিল কি কংগ্রেস দুদিক থেকেই আমাদের ডাক পড়েছে ভোট নেবার জন্যে। এ ডাকাডাকির মানেটা কি? যাদের কোনও স্বাধীনতা নেই তাদের একলম্ফে পলিটিকাল স্বাধীনতায় উঠে যাও বলাটা কি ঠাট্টার মত শোনায় না। "ওঠ ছুঁড়ি তোর পলিটিকাল বিয়ে" কথাটা হুকুমের মত শোনায়। আমাদের জন্ম যেমন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, আমাদের মৃত্যু যেমন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, আমাদের বিবাহও তেমনি আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। আমাদের কুমারী থাকা না থাকার উপর আমাদের কোনরূপ এক্তিয়ার নেই, আমরা পরের হুকুমে সধবা হতে বাধ্য, অপর পক্ষে একবার বিধবা হলে দ্বিতীয়বার সধবা হবারও আমাদের এক্তিয়ার নেই, আমরা বিধবা থাকতে বাধ্য। কুমারী আমরা থাকতে পাব না কিন্তু বিধবা আমাদের থাকতেই হবে। যার নিজের বিয়েতে ভোট নেই নিজের প্রভু সম্বন্ধে যে স্বয়ম্বরা হতে পারে না তার পক্ষে দেশের প্রভু সম্বন্ধে স্বয়ম্বরা হবার অধিকারের কি কোনও অর্থ আছে? এই থেকেই মনে হয়, যে কারণে পলিটিসিয়ানরা জনগণকে নিয়ে টানাটানি করছেন সেই একই কারণে আমাদের নিয়েও টানাটানি করছেন অর্থাৎ তাঁদের নিজের যে অভাব আছে, আমাদের

দিয়ে তা পূরণ করিয়ে নিতে। পলিটিসিয়ানরা জনগণকে দলে টানছেন তাদের বাহুবলের জন্য আর আমাদের টানছেন আমাদের চরিত্রবলের জন্য। এই দুই বল যে পেশাদার পলিটিসিয়ানদের দেহে নেই, এ সত্য কে না জানে।

অপর পক্ষে যাঁরা স্ত্রী-ভোটের বিরোধী তাঁদের ভয় যে ভোট পেলে আমরা সকলে পুরুষ হয়ে যাব। এ আশঙ্কা অমূলক। ভোটের এমন কোনও শক্তি নেই যে ভগবানের সৃষ্টি উল্টে দিতে পারে। ভোট বনমানুষের হাড় নয় যে নুনকে চুন ও চুনকে নুন বানাতে পারে। অবশ্য আজ ভোট পেলে কাল আমরা সবাই পুরুষ মতের নীচে চেরাসই দেব, কেননা আমাদের স্বমত বলে আজ কোনও জিনিষ জন্মায়নি। কিন্তু আমরা যদি কখনো সত্যি সত্যি স্বাধীনতা পাই তাহলে দুনিয়ার লোক দেখতে পাবে যে স্ত্রীমত বলেও একটা পদার্থ আছে যা পুরুষ মতের অপভ্রংশ নয়। ভবিষ্যতের কথা ছেড়ে দিন বর্ত্তমানেই দেখতে পাচ্ছি যে বর্ত্তমান রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের প্রতি আমাদের মনের সহজ আনুকূল্য নেই। কেন নেই শুনতে চান? বলছি—

নিরুপদ্রব-অসহযোগীতা আমাদের ধাতে নেই কেননা সৃষ্টির আদি থেকে আমাদের প্রভুদের সঙ্গে আমাদের যা সনাতন সম্বন্ধ সে হচ্ছে সোপদ্রব-সহযোগীতা। আর আমার বিশ্বাস সৃষ্টির অন্ত পর্য্যন্ত আমাদের পরস্পরের ভিতর এই সম্বন্ধই কায়েম থাকবে, যেহেতু তা থাকা উচিত।

একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পাবেন যে আমার কথা ঠিক। ধরুন যদি আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য পুরুষদের সঙ্গে নিরুপদ্রব

অসযোগীতা সুরু করি তাহলে তার ফলে আমাদের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিও লোপ পাবে। আর ইতিমধ্যে আমাদের প্রভুরা যদি চটেমটে হঠাৎ একদিন সমুদ্র-যাত্রা করেন ত জলে পড়ব আমরা। সুতরাং পুরুষদের দিক দিয়েই দেখুন আর স্ত্রীলোকের দিক দিয়েই দেখুন পুরুষদের সঙ্গে সহযোগীতা আমাদের কর্ত্তব্য এবং সে সহযোগীতা সোপদ্রব হতে বাধ্য, যেহেতু পুরুষ আর স্ত্রীলোক এক জাত নয়। স্বাধীন স্ত্রী-জাতীয়তার সঙ্গে স্বাধীন পুরুষ-জাতীয়তার দিবারাত্র সংঘর্ষ হবেই হবে।

এত কথা যে বল্লুম সে সুধু এই বোঝাবার জন্য যে পুরুষের পলিটিকসের সঙ্গে স্ত্রীলোকের পলিটিক্‌সের আশমান জমিন ফারাক। উদাহরণ স্বরূপে হাল পলিটিক্সের কেজো কথাগুলি ধরা যাক। বলা বাহুল্য সে পলিটিক্সের আধ্যাত্মিক অংশের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ নেই—কেননা পুরুষেই ত আবিষ্কার করেছে যে স্ত্রীলোকের আত্মা নেই। চলতি পলিটিক্সে তিনটি বড় কাজের কথা আছে। প্রথম উকিলের আদালত ত্যাগ, দ্বিতীয় ছেলেদের স্কুল কলেজ ছাড়া তৃতীয় দেশী বিলেতি মিলের কাপড় পোড়ানো। এ তিনটির কোনটিই আমরা হিসেবী কাজ বলে মানি নে।

আদালতে যে উকিলের ভিড় কমা দরকার তা আমরাও জানি তাই বলে সবাইকে যে ওকালতী ছাড়তে হবে এ কথা মানি নে। উকিল আদালতে যায় সরকারের সঙ্গে সহযোগ করতে নয় সপরিবার নিজের অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করতে। এ ক্ষেত্রে ওকালতি ত্যাগ করতে তিনিই পারেন যিনি আদালতে দেদার পয়সা করেছেন কিম্বা এক পয়সাও করতে পারেন নি—অর্থাৎ আদালতের আমির ও ফকিরের

দল। বাদবাকী যারা খেটে খায় তারা যদি না খাটে তাহলে তাদের যাই হোক তাদের স্ত্রীদের হবে সধবার একাদশী। তার পর কাপড় পোড়ানোর সার্থকতা আমরা দেখতে পাইনে। বোধ হয় তার কারণ আমরা শিক্ষিত নই। আমাদের মনে হয় বিলেতি কাপড় না পুড়িয়ে ছিঁড়লে স্বরাজ্যের কোনও ক্ষতি হত না অপর পক্ষে তাতে আমাদের গৃহরাজ্যের ঢের লাভ হত। ন্যাতাকানী যে গেরস্থালীর বহুকাজে লাগে সে সত্য অবশ্য আপনাদের কাছেও অবিদিত নেই। আর যদি পোড়ানটা আপনাদের মোক্ষলাভের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে কাপড় ছিঁড়ে আমাদের হাতে দিলে আমরা তার সলতে পাকিয়ে তৈলসিক্ত করে প্রদীপ জ্বালাতুম, তাতে সে কাপড়ও পুড়ত এবং সেই সঙ্গে আমাদের ঘরও আলো হত।

কিন্তু আপনাদের কাছে এ সকল যুক্তি দেখানো বৃথা, যেহেতু কাপড় পোড়ানোর আপনারা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বার করেছেন। বস্ত্রদাহের নাম যখন হয়েছে বস্ত্রযজ্ঞ তখন তার উপর আর কথা বলে চলে না, বিশেষত আমাদের তরফ থেকে। আপনারা যখন আমাদের আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্য, ঢাক ঢোল বাজিয়ে আমাদের জ্যান্তে পুড়িয়ে ছাই করতেন তখন আপনাদের নিজের আত্মার পবিত্রতা রক্ষার জন্য আপনারা ঢাকঢোল বাজিয়ে যে কাপড় পুড়িয়ে ছাই করবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আশা করি সতীদাহের ফলে আমরা যেমন হাত হাত স্বর্গরাজ্য লাভ করতুম বস্ত্রদাহের ফলে আপনারাও তেমনি হাত হাত স্বরাজ্য লাভ করবেন।

আর এক কথা না বলে থাকতে পারছি নে। জানেনই ত আমরা কিছু বেশি বকি। যাদের হাত চলে না তাদের মুখ চলে—

এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। ধুতির সঙ্গে শাড়ী সহমরণে যেতে পারবে না। ধুতি পুড়িয়ে আপনারা কৌপিন ধারণ করতে পারেন তাতে আপনারা হয়ে উঠবেন মহাপুরুষ যেমন সেকালে পুরুষেরা পৈতে পুড়িয়ে ভগবান হতেন। বলা বাহুল্য আমাদের পক্ষে বসনের ওরূপ সংক্ষিপ্ত সার অঙ্গীকার করা অসম্ভব। অথচ আমরা যদি বসন সঙ্কোচ না করি, তাহলে দেশে কাপড়ের অভাব ঘুচবে না। পুরুষের চাইতে কাপড়ের খরচ আমাদের যে কেন ঢের বেশি তার হিসেব দিচ্ছি। আমরা পরি দশহাত শাড়ী বেহারী স্ত্রীলোকে বারো হাত, গুজরাটী স্ত্রীলোক চৌদ্দ হাত, মাদ্রাজী স্ত্রীলোক ষোল হাত, মারহাটি স্ত্রীলোক আঠারো হাত। আর যারা শাড়ী না পরে ঘাঘরা পরে, তাদের কাপড় চাই দশগজ থেকে বিশ গজতক্। এই হিসাব দৃষ্টে আমার মনে হয় পুরুষরা যদি সবাই ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরেন তাহলে পুরুষ পিছু পাঁচ হাত করে কাপড়ের সাশ্রয় হয় উপরন্তু তাতে হিন্দু মুসলমানের স্ত্রী পুরুষের গৃহস্থ সন্ন্যাসীর প্রত্যক্ষ প্রভেদটা দূর হয় এক কথায় বেশের হিসেবে ও দেশের হিসেবে দু-হিসেবেই এই লুঙ্গীধারণ পুরুষদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষত যখন লুঙ্গিই হচ্ছে আপনাদের এ যুগের বিকচ্ছ বীরত্বের উপযুক্ত প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

তারপর স্কুল কলেজ ছাড়বার কথা। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে পুরুষরা যদি ছেলেদের পক্ষে স্কুল কলেজ ছাড়া একান্ত আবশ্যক মনে করেন ত ছেলেরা তা ছাড়ুক তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে স্কুল কলেজ ভাঙ্গবার কোনও প্রয়োজন দেখি নে। স্ত্রী-স্বাধীনতার গোড়া পত্তন ত স্ত্রী-শিক্ষাতেই হবে। অতএব সরকারি স্কুল কলেজে আমাদের সব ভর্ত্তি করে দেওনা

কেন? স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে তোমাদের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে স্ত্রী পুরুষের এক শিক্ষা হওয়া উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে সে আপত্তি ত আর টেকে না। কেননা ছেলেরা যখন ন্যাসনাল স্কুলে চরকা কাট্‌তে বসল তখন সরকারী স্কুলে আমরা জ্ঞান বিজ্ঞান কাব্য দর্শনের চর্চ্চা কর্‌লে, পুরুষদের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের শিক্ষার আকাশ পাতাল প্রভেদ থাক্‌বে। আর সরকারী স্কুলে ছেলে পাঠানো সম্বন্ধে তোমাদের প্রধান আপত্তি সেখানে ছাত্রের অন্তরে দাস মনোভাব জন্মে। ছাত্রী সম্বন্ধে সে আপত্তি ত খাটে না। সরকারী স্কুলে যদি আমাদের দাসী মনোভাব পাকা হয় তাহলেই ত আমরা পূরো দেবী হব।

আমার শেষ কথা এই যে এ সব স্বরাজ লাভের নিরুপায়ের উপায় হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। কেননা স্বরাট ভারতবর্ষেও, অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা ও শিক্ষা সমস্যা সমান বজায় থাক্‌বে যেমন অপরাপর সকল স্বরাট দেশে পূর্ণমাত্রায় আছে।

জনৈক বঙ্গনারী।